কি বসন্তে কি শরতে

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

বুক সোসাইটি

প্রকাশনা ঃ

বুক সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া লিঃ

২, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

অংকন ঃ

শ্যামল সেন

মুদ্রণ ঃ

দেবদাস নাথ, এম-এ, বি-এল

সাধনা প্রেস প্রাঃ লিমিটেড

৭৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

দাম ঃ

তিন টাকা

॥ নিবেদন ॥

'কি বসন্তে কি শরতে' বিভিন্ন সময়ে রচিত কয়েকটি গল্পের সংকলন।

বসন্ত ও শরতের ফুল ও ফসল সবই ভিন্ন জাতের। এই সংকলনের গল্পগুলিও তেমনই ভিন্ন সুরের। এদের একত্র পরিবেশন করে যদি কোন বেরসিক মেজাজের পরিচয় দিয়ে থাকি, সে দায়িত্বও আমার-ই।

'পদ্মিনী' ও 'যশোবন্তী' দেশে এবং অন্যান্য গল্পগুলি বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রয়োজনবোধে তাদের মার্জিত ও বর্ধিত করা হলো। কয়েকটি গল্প পাঁচ ছয় বছরের পুরাণো। তাদের ক্ষেত্রেই বেশী পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেছি।

আমাদের সাহিত্য ছোট গল্পে সুসমৃদ্ধ। বস্তুত, এত ভালো গল্প লেখা হয়েছে ও হচ্ছে, সে কথা মনে করলে এই সংকলন সম্পর্কে বিশেষ কোন কথা বলার মতো পাই না। তবু যাঁদের ভরসায় এই সংকলন পেশ করছি, আমাদের সেই পাঠকসমাজ নানা মেজাজের। একজন-ই নানা মেজাজের লেখা পড়তে ভালবাসেন। এবং তাঁদের বরাভয়ও বহুদূর প্রসারিত। সেই ভরসা-ই এই বইয়ের একমাত্র আশ্বাস।

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

৩২-এ পদ্মপুকুর রোড
কলিকাতা-২০

। লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থ ॥

ঝাঁসীর রাণী

নটী

যমুনার তীর

মধুরে মধুর

উৎসর্গ

'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর অমর স্রষ্টা
অদ্বৈত মল্লবর্মণের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে— ॥

সূচী

যশোবন্তী	...	...	১
সতীরাণীর ঘাট	...	...	২১
পদ্মিনী	...	...	৪৩
শুধু পটে লিখা	...	...	৫৮
জলে ঢেউ দিওনা	...	...	৭৭
চম্পা	...	...	৯৫
পরম আত্মীয়	...	...	১১২
চিন্তা	...	...	১২৫
ছায়াবাজি	...	...	১৩৬

যশোবন্তী

হীরনিয়া। উজ্জয়িনী আর মান্দাসোরের মাঝামাঝি মাঝারি একটা স্টেশন। রাত বারোটা হবে। ভোরের আগে ট্রেন নেই। পাশে এসে বসলেন ডাক্তার মালহোত্রা। —সেন সাহেব, একটা সিগারেট খান।

সিগারেট নিলেন সেন সাহেব। আধা অন্ধকারে সুনিপুণ ধূম্রচক্র বানাতে লাগলেন মালহোত্রা। কিছুক্ষণ গেল। মালহোত্রা বললেন—সেন সাহেব, একটা গল্প শুনবেন?

—আপনি বলবেন?

—নিশ্চয়!

—মন্দ কি! হেলান দিয়ে বসলেন সেন সাহেব। হীরনিয়াতে নতুন হাসপাতাল খোলা হ'ল। এক্স-রের যন্ত্র বিক্রী করেন সেন সাহেব, ডেনমার্কের একটা ফার্মের প্রতিনিধি হিসাবে। তাই তাঁকে খবর দিয়েছিলেন মালহোত্রা। উজ্জয়িনী থেকে তাঁকে আনিয়ে হাসপাতালে মেসিনটা বিক্রী করিয়ে দিলেন আজ। ষোল হাজার টাকায় বিক্রী হ'ল। কমিশন পাবেন সেন সাহেব, তাছাড়া যশোবন্তী দেবীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁর টাকাতেই হাসপাতাল হয়েছে। মেসিনও কেনা হ'ল। মহিলার সঙ্গে সেন সাহেবের সময়টা ভালই কেটেছে। ভরসা মিলেছে—যশোবন্তী দেবী অদূর ভবিষ্যতে যেখানে যেখানে টাকা দিয়ে মেসিন কিনে দেবেন, সেখানেই সেন সাহেবের ডাক পড়বে। মালহোত্রা আগাগোড়াই ছিল, শুধু যশোবন্তী দেবীর সঙ্গে কথা বলবার সময় কোথায় যেন সরে পড়ল। খামখেয়ালী লোক!

তাঁর মনের কথা বুঝল মালহোত্রা। বলল—ভাবছেন, আমি সরে পড়লাম কেন? সেটাই ত' গল্প। সেন সাহেব, আপনি জানেন না যশোবন্তীকে আমি যে এড়িয়ে গেলাম, তাতে বেঁচে গেল যশোবন্তী। নয়তো লজ্জা পেয়ে যেত। মাথা নীচু হয়ে যেত। আমি ওর লাজ রাখলাম সেন সাহেব, সরে এলাম।

বিশ বছর আগে আমি ওকে শেষবার দেখেছিলাম। জয়পুরের কাছে একটা ছোট গ্রাম। রাত হবে একটা। ঠিক এই রকমই রাত সেন সাহেব, অল্প অল্প বৃষ্টিও ছিল। আমার ঘরের দরজা খুলে ঢুকেছিল যশোবন্তী। আমার পা ধ'রে কেঁদেছিল। বলেছিল, একটু বিষ দাও ডাক্তারবাবু, আমার সব জ্বালা জুড়িয়ে যাক। আমি যে আর সহ্য করতে পারি না। আমি পারিনি সেন সাহেব। আমি পালিয়ে এসেছিলাম। বলেছিলাম—আমাকে তুমি জড়াচ্ছ কেন যশোবন্তী? ও বলেছিল—নয় তুমি আমাকে নিয়ে পালিয়ে চল ডাক্তার সাহেব। বুঝে দেখুন সেন সাহেব, আজ আপনি যশোবন্তীকে দেখলেন, ওর বয়স হয়ে গিয়েছে পঁয়তাল্লিশ। তখন ওর বয়স পঁচিশ। রূপ ত' আপনি দেখলেন নিজের চোখে—ওর যৌবনের জলুসের কথা ভাবুন। আমার বয়স তখন তিরিশ। যশোবন্তী কাঁদছে অঝোরে আমারই পায়ের কাছে বসে।···ওপাশের ঘরে তার স্বামী মৃত্যুশয্যায়। ছোট ছেলে রয়েছে। হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হ'ল যশোবন্তীর কাছ থেকে এখনি যদি সরে যেতে না পারি, তাহ'লে ধরা পড়ে যাব, আমার মনটা দেখে ফেলবে যশোবন্তী। জেনে যাবে, আমি আমার মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুকে বাঁচাতেই শুধু আসিনি; যশোবন্তীর সাহচর্যের প্রলোভনও আমার ছিল। রূঢ় হয়ে উঠলাম। বললাম— মাঝরাতে রঙ্গালাপ করতে এসো না আমার সঙ্গে। সময় নেই আমার।···

হঠাৎ দরজায় ঠক্ ঠক্ ক'রে শব্দ হ'ল। বুক শুকিয়ে গেল আমার। গোঁড়া রাজপুত পরিবার। মেয়েরা দিনমানে স্বামীর

সঙ্গে দেখা করে না। যশোবন্তীর শ্বশুরবাড়িতেও বিধিনিষেধের অন্ত নেই। সেখানে মাঝরাতে বাড়ির বড়বৌয়ের সঙ্গে আমি ডাক্তার হয়ে এমনি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছি, ভেবে দেখুন কি পরিণতি হ'তে পারত।

বাঁচিয়ে দিল যশোবন্তী। এক মুহূর্তে কেমন করে বদলে গেল। আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে উঠল—আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিন ডাক্তারবাবু···আমার স্বামী ছাড়া আমার শ্বশুরের কেউ নেই···বুড়ো বাপ-মা মরে যাবে ডাক্তারবাবু···আমি আত্মহত্যা করব!.

অপূর্ব অভিনয়। পাথর হয়ে গেছি আমি। দরজা ঠেলে ঢুকলেন নবলের বাবা—যশোবন্তীর শ্বশুর। একখানা দরজা জোড়া বিশাল শরীর। চুল, গোঁফ, দাড়ি সব পাকা। ঢুকে যশোবন্তীকে দেখে ডাকলেন—যশোবন্তী! বেটি···পাগল হয়ে গিয়েছিস্? কি করছিস্ বল্? ডাক্তারবাবু কি করবেন?

যশোবন্তী আকুল হয়ে শ্বশুরের পা জড়িয়ে ধরল পাল্টা—পিতাজী, ডাক্তারবাবু দেবতা···আপনি বলুন আপনার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিতে···

কান্না শুনে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল যশোবন্তীর ছেলে। তার দিকে চেয়ে চোখে কি ভাব খেলে গেল যশোবন্তীর, দেখে আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম সেন সাহেব।···ঘৃণা···স্পষ্ট দেখলাম ঘৃণা জ্বলে উঠল তার অশ্রুভেজা চোখে। সমান ঘৃণা আর একটু তাচ্ছিল্য দিয়ে আমার দিকেও তাকাল সে। চাহনির একটা ঝিলিক মাত্র। তারপরেই ঘোমটা টেনে বেরিয়ে গেল যশোবন্তী। তার দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন শ্বশুর। বললেন—পাগলী!

আমার ভয় তখনও কাটেনি। ভাবলাম, ভোর হ'লে আর এখানে নয়। কিন্তু ভোর বেলা জয়পুর থেকে ডাক্তার সেহ্‌গাল এলেন। দু'জনে পুরো দিনভর লড়লাম একটা ভারী ডোজের

মরফিয়া খাওয়া আধমরা রুগীর সঙ্গে। সন্ধ্যা বরাবর নিশ্চিন্ত হলাম। জানলাম, বেঁচে উঠবে নবল। রাতেই চলে এলাম। যখন আমরা দু'জন বেরিয়ে আসছি তখন ঢাকঢোল বেজে উঠল বাড়িতে। ঢাকঢোল বাজিয়ে সেজে গুজে চলেছে যশোবন্তী রানীর মতো। স্বামী বেঁচে গেল জেনে বুকের রক্ত দিয়ে মন্দিরে পূজো দিতে চলেছে। দেখে ভয় হ'ল আমার। মনে হ'ল, কি সাংঘাতিক মেয়ে এই যশোবন্তী, সবটাই তার অভিনয়। নইলে যে স্বামীর সঙ্গ তার কাছে অসহ্য, যার ভয়ে সে নিরন্তর শঙ্কিত, তারই কল্যাণ কামনায় বুকের রক্ত দিয়ে পূজো দেয় যশোবন্তী? চলে এলাম আমি।

জোরে জোরে সিগারেট টানতে লাগল মালহোত্রা। বলল—সেন সাহেব, একটা কথাও আপনি বুঝবেন না, যদি না আপনাকে ওদের পুরো ইতিহাসটি বলি। নবল আর যশোবন্তীর জীবন নিয়ে গল্প হ'ত না সেন সাহেব, যদি না কুঁয়ার সাহেব এসে পড়ত তার মধ্যে।

সেন সাহেব বললেন—শ্যামগড়ের কুঁয়ার সাহেব? তাঁর নামেই ত' হাসপাতালটা উৎসর্গ করেছেন যশোবন্তী দেবী। তাই না?

হ্যাঁ। নইলে জমবে কেন বলুন?—মালহোত্রার কণ্ঠে কিন্তু ব্যঙ্গ নেই, আছে একটু বিষাদমিশ্রিত বিস্ময়। বললেন—সেন সাহেব, যশোবন্তী আর নবল পাশাপাশি গাঁয়ের ছেলে মেয়ে। যশোবন্তীর বয়স যখন আট, আর নবলের বয়স তেরো, তখনই বিয়ে হয় ওদের। ওদের বিয়ের নিয়ম জানেন ত'? শৈশবে হয় বিয়ে। তারপর বরক'নে দু'জনের বয়স হলে আবার অনুষ্ঠান উৎসবের পর ঘর করতে আসে মেয়ে। যশোবন্তীর বাবা কুলে সম্মানে বড়। শিশোদীয়া ঘরের রক্ত আছে শরীরে। অবিশ্যি পয়সার স্বচ্ছলতা তাঁর নেই। নবলের বাবা বংশমর্যাদায় সমকক্ষ নন বৈবাহিকের।

তবু তিনিও মানী ঘরের ছেলে। তাছাড়া, তিনি জয়পুরের পাশ করা উকীল। গ্রামে জানেন ত', মামলা করবার নেশা আছে মানুষের। তাছাড়া, খুন জখমও সহজেই হয়। কাজেই নবলের বাবা সহজেই পয়সা কামাতে লাগলেন। জমি হল, মোষ কিনলেন, ইঁদারা দিলেন বাপ মায়ের নামে। তাঁরই এক ছেলে নবল। ছেলেকে জয়পুরের বনেদী ইস্কুলে রেখে পড়ালেন ঠাকুর সাহেব। বংশমর্যাদার যেটুকু কম্‌তি ছিল, যশোবন্তীর সঙ্গে ছেলে বিয়ে দিয়ে সেটা কায়েম করলেন।

নবল কলেজে পড়তে এল আমাদের সঙ্গে। আঠারো বছর বয়েস, পড়াশুনোয় ভাল। তবে কলেজে পড়াতে তার মা'র ছিল আপত্তি। যথেষ্ট পড়েছে—আর পড়ে কি হবে? এবার দোহ্‌রা করে বৌ আনবেন তিনি ঘরে। গ্রামে এসে বসবে নবল, বাপ যা জমিজমা করেছেন তাই দেখবে, বাপের সঙ্গে কাজ করবে। নবলের বাবার মতলব অন্যরকম। 'ল' পড়াবেন নবলকে। তাঁর ডবল রোজগার করবে নবল। চায় তো বিলেত যাবে। চায় তো দিল্লী, বোম্বাই, যেখানে খুশী প্র্যাক্‌টিস্ করবে।

নবলের বিয়ে নিয়ে ক্ষ্যাপাতাম আমি। আমি কাশ্মীরের ছেলে। শৈশবে বিয়ে আমার দেশে বে-নজীর নয়। কিন্তু আমি ত' বিয়ে করিনি। নবলকে ঠাট্টা তামাসা করতাম।

'দোহ্‌রা' হবার আগে আগে নবল চলে গেল গাঁয়ে। আমাদের সব নেমন্তন্ন করে গেল।

ছাত্র-জীবন—হৈ হৈ করে গেলাম আমরা পাঁচজন। আমাদের নিতে হাতী এল স্টেশনে, নবল এল ঘোড়া চড়ে। জয়পুর থেকে সত্তর মাইল নয় তো, যেন সাতশো মাইল দূরে এসেছি, আর দুশো বছর পিছিয়ে গিয়েছি। ঠাকুরসাহেবের ছেলের দোহ্‌রায় জয়পুর থেকে কলেজী ছোকরারা এসেছে খবর পেয়ে ক্ষেতের চাষীরা সকৌতুকে দেখল চেয়ে চেয়ে।

বৌ এল পরদিন। সন্ধ্যেবেলা আতসবাজী পুড়িয়ে, বোমা ফাটিয়ে পাল্কীতে বৌ বসিয়ে নিয়ে এল নবল। আমরা বন্ধুবান্ধবরা মিলে বৌয়ের জন্যে উপহার এনেছিলাম। জেদ ধরলাম বৌয়ের হাতে দেব। নবলের বাবা মা অন্যদের আপত্তি উপেক্ষা করলেন। উপহার নিয়ে গেলাম তাঁদের সঙ্গে আমরা ক-জন।

ভেতরের ঘর। নিচু দরজা, ঘরটা আঁধার আঁধার। ডায়নামো বসিয়ে ইলেক্‌ট্রিক এনেছেন নবলের বাপ। ছেলে বৌ-য়ের জন্যে ঘর সাজিয়েছেন নতুন ফার্নিচারে। খাটের ওপর জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল যশোবন্তী। মাথার ওপর দিয়ে বুক অবধি 'ওড়না। লজ্জায় মাথা আরো নিচু। নবলকে বললাম—ভাবীর মুখ না দেখালে হবে না। ···অতর্কিতে ঘোমটা তুলে দিল নবল। মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমরা। একটু সম্ভ্রম জাগায় এমনিই চেহারা। ষোল বছর বয়স হলে কি হয়, বেশ মর্যাদা ও গাম্ভীর্য আছে মনে হ'ল। স্মিত ও সলজ্জ হেসে নমস্তে জানাল। উপহার নিল। অল্প স্বল্প ঠাট্টা তামাসা করে চলে এলাম আমরা।

আমরা ফিরলাম পরদিনই। নবল রয়ে গেল।

তারপর পাশ করে বেরিয়ে গেলাম আমি। নবল মাঝে মাঝে চিঠি লিখত। যশোবন্তীর কথায় তার অর্ধেকটা ভরা থাকত। যশোবন্তী ঘরে আসবার পর থেকে তাদের সুখ-সমৃদ্ধি বেড়ে চলেছে। খুব ভাগ্যবতী মেয়ে সন্দেহ নেই। ····· আমাদের যাবার জন্যেও লিখত, কিন্তু ছাত্রজীবনের ব্যাপার জানেন ত', একটার পর একটা হুজুগ নিয়ে জড়িয়ে পড়লাম আমরা। সরকারী টাকায় পড়ছিলাম আমি, ডাক্তারী পড়তে চলে এলাম বোম্বাই। পাঁচটা বছর কোথা দিয়ে চলে গেল।

বম্বে থেকে খাণ্ডালায় গিয়েছি। পুনা ফিরতি নেমেছি দুইদিনের জন্যে। আমরা তিনজন। আমার বন্ধু ডাক্তার কার্লেকার, মিসেস কার্লেকার আর আমি। কার্লেকারদের বন্ধু পারেখের

বোর্ডিং হাউস-এ উঠেছি। আমার পাশের তিনখানা ঘরের একখানা স্যুইট। জানলাম, নিয়েছেন কোন একজন দেবনাগ। পৌঁছিয়েই আমরা চলে এলাম স্টেশনে। স্টেশনের খাবার ঘরে খেলাম, বেড়াতে গেলাম লোনাভ্‌লা। ফিরতে ফিরতে বারোটা বাজল। কার্লেকাররা ঘুমুতে চলে গেল। শরৎকাল। খাণ্ডালায় সেই রাতটা আমার এমন চমৎকার লাগল! বাড়ির পেছনে পাহাড়, পাহাড়ের ঢালু গায়ে বাড়ি। পরিষ্কার বাতাস। সবে বর্ষা শেষ হয়েছে। পাহাড়ের গা দিয়ে ঝরে পড়েছে অসংখ্য ঝরনা। পশ্চিমঘাটের ওটা একটা চমৎকার বৈশিষ্ট্য সেন সাহেব—না দেখলে বুঝবেন না। ঝরনার শব্দ আসছে কানে। আর ফুল···সেন সাহেব ফুলে ফুলে নিচু হয়ে পড়েছে রাত-কি-রানী আর কুচি ফুলের গাছ। এক আকাশ তারা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, হঠাৎ কানে এল আমার পাশের বন্ধ দরজার পেছন থেকে মেয়ের গলায় ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। ···আমি আর সহ্য করতে পারি না...তুমি মেরে ফেল আমাকে....বল আমার কি দোষ! পুরুষের ক্রুদ্ধ ও চাপা কণ্ঠে তর্জন শোনা গেল। তারপর হঠাৎ থেমে গেল কান্না। বুঝলাম, আমার এখানে বলবার বা করবার মত কিছু নেই। ঘরে চলে এলাম। কিন্তু অদ্ভুত কৌতূহল হল মনে।

সকালে চা-এর টেবিলে পৌঁছতে দেরী হয়ে গেল। ঢুকলাম যখন তখন আলাপ হ'ল আমার পাশের ঘরের অতিথির সঙ্গে। মাথা নিচু করে কাগজ দেখছিলেন ভদ্রলোক। কাঁচা পাকা মেশানো চুল। মুখ তুললেন যখন, অবাক হয়ে গেলাম। আমার বন্ধু নবল। তখন মনে পড়ল নবল সিং দেবনাগ ছিল তার পুরো নাম। যশোবন্তীকেও দেখলাম। শুধু আমি নয়, ঘরের সব ক-জনই তাকিয়ে দেখল। সেই গ্রামের মেয়ের সহজ ভাব নেই। পুরো শাদা রেশম আর হীরে পরেছে যশোবন্তী—আরো অনেক সুন্দর হয়েছে সে। কিন্তু চোখের নিচে কালি। বিষণ্ণ চাহনি।

আমার মনে হ'ল কোনো একটা ভয়ের ছায়া দেখলাম তার চোখে। নবলের চেহারাই বা কি হয়ে গিয়েছে? চোখের নিচে কালি, কপালে রেখা, চুল কাঁচাপাকা। যশোবন্তীর হাত ধরে ঢুকল একটি বাচ্চা ছেলে। ধবধবে রং, লাল চুল—চমৎকার দেখতে। বয়স হবে বছর দুই। নবল কেমন একটা অভদ্র আর রূঢ় ব্যবহার করল যশোবন্তীর সঙ্গে। তার নির্দেশে যশোবন্তী নমস্কার করল আমাকে। আমাকে দেখে নবল যেন অকূলে কূল পেয়েছে মনে হ'ল। ঘরে নিয়ে গেল আমাকে। একখানা ছোট খাট। খাটের নিচে দেখলাম কয়েকটা বোতল। নবল স্বীকার করল, হ্যাঁ, সে প্রচুর মদ খাচ্ছে ইদানীং। বলল—মালহোত্রা, আমি কাপুরুষ, নইলে খুন করতাম কুঁয়ার সাহেবকে, তারপর আত্মহত্যা করতাম আমি। তা-ও পারছি না, অথচ যশোবন্তীকেও কষ্ট দিচ্ছি। বিশ্বাস কর মালহোত্রা, আমার বেঁচে থাকবার কোন অধিকার নেই।

দরজায় এসে দাঁড়াল যশোবন্তী। বলল—আবার তুমি—! আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বলল—ছি ছি···ডাক্তার সাহেব—তোমার বন্ধু—তাঁর সামনে··· ।

হঠাৎ কেঁদে ভেঙে পড়ল যশোবন্তী। আর আশ্চর্য কি, নবল রূঢ় কণ্ঠে বলল—যাও, যাও যশোবন্তী·· ···আমার সামনে থেকে যাও তুমি······

তার কথা শেষ না হতেই বেরিয়ে গেল যশোবন্তী। আমি বললাম—নবল, তুমি এতখানি নিচে নেমে গিয়েছ? তোমার স্ত্রীকে আমার সামনে অপমান করছ······ । বেরিয়ে এলাম আমি। পাশের ঘরের দরজা বন্ধ। নইলে ক্ষমা চাইতাম যশোবন্তীর কাছে। কিন্তু নবল আমার পেছনে পেছনে এল। বলল—মালহোত্রা, আমার কথাগুলো শোন, পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি, জ্বলে যাচ্ছি আর তুমি দেখছ সামাজিক আদব কায়দা।

তার কণ্ঠে একটা মিনতি ছিল। চোখে ছিল একটা সকরুণ বিষাদ। সেন সাহেব, আপনি কি বলবেন জানি না—আমি ঠেলতে পারলাম না নবলের অনুরোধ। পেছন পেছন গেলাম তার ঘরে। আর কি জানেন। কৌতূহল, তা সে যতই 'ভাল্‌গার' মনে করুন না কেন দুর্দম্য হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। নবল আর আমি চলে গেলাম পাহাড়ের গায়ে। দুটো বড় পাথরের ছায়ায় বসলাম।

নবল বলতে লাগল তার কথা। বড় আশ্চর্য কথা সেন সাহেব।

রাজস্থান কতখানি প্রাচীনপন্থী আর অনুন্নত, তা তো দেখছেন আপনি। যেমন গরীব দেশ, তেমনি গোঁড়া সমাজ। অনেক কানুন এদের মধ্যে শত শত বছর চলে আসছে, আজও তার পরিবর্তন হয়নি। এই এখন, উনিশ শো সাতান্ন সালে যা দেখছেন, বিশ বছর আগে ত' এরকম ছিল না। কিরকম ছিল আপনি ঠিক বুঝবেন না সেন সাহেব। বাংলা দেশের সঙ্গে তার কোন মিল নেই।

যশোবন্তী আর নবল খুব সুখী হয়েছিল। নবল শেষ অবধি জয়পুরে বসেছিল উকীল হয়ে। মাঝে মাঝে গ্রামে আসত। যশোবন্তীর সঙ্গে কথা ছিল এবার তাকেও জয়পুরে নিয়ে যাবে।

এমনি সময়, শীতের মুখে নবলদের গ্রামের কাছে তাঁবু ফেললেন শ্যামগড়ের কুঁয়ার সাহেব বনবীর সিং,……ওরা বুঝি রাঠোর। নবলের পিতৃবংশ আসলে শ্যামগড়ের প্রজা। তাদের বর্তমান গ্রাম হচ্ছে বিবাহসূত্রে পাওয়া। নবলের বাবা নেমন্তন্ন করে কুঁয়ার সাহেবকে নিজের বাড়িতে আনলেন। যশোবন্তীকে নিয়ে গেলেন প্রণাম করাতে। রাজার প্রতি আনুগত্য ওরা কেমন করে প্রকাশ করে জানেন ত'? লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে—অন্নদাতা, প্রাণদাতা ব'লে, আর নমস্কার করে। তাছাড়া,

বিয়ের আগেই বরকে রাজবাড়িতে ঘুরিয়ে আনবার নিয়ম আছে, বিয়ের পরে বৌ-কে, যদি সম্ভব হয়।

খুব সেজেগুজে গেল যশোবন্তী। প্রণাম জানাল। মুখ দেখলেন কুঁয়ার সাহেব। বললেন—ঠাকুরসাহেব, আশীর্বাদ আমি পাঠিয়ে দেব।

পরে আর একদিন এমনি এলেন হঠাৎ। বললেন, তাঁর তাঁবুতে নাকি স্টোভটা খারাপ হয়ে গিয়েছে, স্টোভ একটা ঠাকুর সাহেবকে দিতে হবে।

দুইদিন যেতে না যেতে ঠাকুর সাহেবকে ডেকে পাঠালেন কুঁয়ার সাহেব তাঁর তাঁবুতে। যে প্রস্তাবটা জানালেন, সেটা আপনার কানে খুব আশ্চর্য লাগবে সেন সাহেব, কিন্তু মানুষকে আপনি দয়া করে বুঝবেন তার দেশ, কাল আর সংস্কার দিয়ে। সোজাসুজি জানিয়েছিলেন যশোবন্তীকে খুব ভাল লেগেছে তাঁর। আর তখন পর্যন্ত, কি জানেন, রাজোয়ারা ঘরের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়া, আর তার ফলে সন্তান হওয়া খুব একটা বে-নজীর নয়। এইসব সন্তানদের বলা হয় ক্ষেত্রজ পুত্র আর তার ফলে মেয়েটির পতিকুল উচ্চ সম্মান পায়। কুঁয়ার সাহেবের প্রস্তাব শুনে, বৃদ্ধ ঠাকুর সাহেব বলেছিলেন—তার আগে বৌ-কে তিনি কেটে ফেলে দেবেন। কুঁয়ার সাহেব দুইবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করেছিলেন। বলেছিলেন, অজস্র সম্পদ, সম্মান সবই পাবে যশোবন্তী। আর এমন নয় যে এ ঘটনার কথা এই প্রথম শুনছেন ঠাকুর সাহেব।

ঠাকুর সাহেব গম্ভীর হয়ে ফিরলেন বাড়ি। যশোবন্তীকে ডেকে পাঠালেন। তার দিকে কেমন নতুন দৃষ্টিতে তাকালেন। কি বলতে চেয়েও বলতে পারলেন না।

পরদিনই তাঁবু থেকে ক্ষমা চেয়ে চিঠি পাঠালেন কুঁয়ার সাহেব। অন্যায় হয়ে গিয়েছে তাঁর, যেন ক্ষমা করেন ঠাকুর সাহেব। তাছাড়া, চলে-ও যাচ্ছেন তিনি।

তাঁবু উঠিয়ে যেদিন চলে গেলেন কুঁয়ার সাহেব, সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর সাহেবের মাসতুতো ভাইয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন নবলের মা, যশোবন্তীকে নিয়ে। পাঠকজী ভজন গাইবেন জেনে বৌ-কে পাল্কী দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। রাত তখন আটটা হবে।

রাত সাড়ে আটটা। ঠাকুর সাহেব উঠোনে বসে মামলার কথাবার্তা বলছেন লোকজনের সঙ্গে। পাল্কীবাহকরা চারজন ছুটে এল। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ঠাকুর সাহেবের পা ধরে। সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। মোটর গাড়ী তাদের পথ রুখেছিল। ধরে নিয়ে গিয়েছে বহুজীকে। ভয় পেয়ে রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছিলেন বহুজী।

তার পরের কথা বলে কি হবে বলুন। অন্যত্র কি হত জানি না। এখানে ঠাকুর সাহেবকে দোষ দিল অনেকেই। বলল, অনেকেই রাজোয়ারা ঘরে যোগাযোগ স্থাপন করাকে গৌরব বলে মানে। তাঁর ক্ষেত্রেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? সমাজকেই ভয় ছিল ঠাকুর সাহেবের। সমাজের মনোভাব তিনি বুঝলেন। আশ্বস্ত হলেন। নবলের কথা? যুক্তি দিয়ে বুঝলেন, নবলের আর একবার বিয়ে দেওয়া চলবে।

'আর যশোবন্তী?' প্রশ্ন করলেন সেন সাহেব।

'যশোবন্তীর কথাই ভাবুন। সাতদিন বাদে রাত দশটায় ধূলি-ধুসর একখানা গাড়ী এসে দাঁড়াল দরজায়। মাথা নিচু করে কাঁদতে কাঁদতে নামল যশোবন্তী। খবর পেয়ে তৈরি ছিলেন ঠাকুর সাহেব। তাঁকে দেখে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে গেল যশোবন্তী, কিন্তু তাকে তুলে ধরলেন ঠাকুর সাহেব। তিনি ভৎর্সনা করলে বুঝত যশোবন্তী। মারলেও আশ্চর্য হত না। কিন্তু তাঁর ব্যবহারে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে।

তারপর কয়দিন ধরে নাকি হাজারটা যাগযজ্ঞ, পূজা, হোম চলল। দলে দলে সবাই দেখতে এল যশোবন্তীকে। উদ্‌ভ্রান্ত

হয়ে গেল যশোবন্তী। কাঁদতেও ভুলে গেল সে। একটা জান্তব কৌতূহলে নিষ্ঠুর হয়ে উঠল মেয়েরা। বৌ-রা জিজ্ঞাসা করল, রাজাসাহেবের ঘরকন্না কি রকম? বর্ষীয়সীরা অবাক হয়ে বললেন—এ ত' সেই পুরানো কঙ্কণ।

আর লজ্জার কথা কি গৌরবের কথা ভেবে দেখুন—অলঙ্কার এল প্রস্থে প্রস্থে শ্যামগড় থেকে। এত জমি মিলল যে নিজেই ছোট খাট সর্দার বনে গেলেন ঠাকুর সাহেব।

কিন্তু যশোবন্তীর কথা ভাবুন। তারপরে জানা গেল, সন্তান সম্ভাবিতা যশোবন্তী। খবর পেয়ে নবল এল। আনন্দিত হয়ে, উপহার নিয়ে। তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন ঠাকুর সাহেব। নবল আমাকে বলল—আমি যশোবন্তীকে খুন করতে পারতাম মালহোত্রা, কিন্তু কিছুতেই পারলাম না। আমি ক্ষেপে গিয়েছিলাম—বাবাকে বলেছিলাম কুত্তা,—আর বলেছিলাম যশোবন্তীকেও খুন করব, সেই কুঁয়ারকেও খুন করব। তুমি জান না মালহোত্রা, অপমান করে কথা বলেছে বলে বাপ ছেলের মধ্যে খুনোখুনি হয়ে গিয়েছে এ নজীর বিরল নয় আমাদের দেশে।

যশোবন্তীর ঘরে যখন ঢুকলাম, তখন দুজনে মুখোমুখি দাঁড়ালাম। থমকে গেলাম। এ সে যশোবন্তী নয়, একে আমি চিনি না। সর্বাঙ্গে হীরে মুক্তো। চোখে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি। আহত, ভয়ার্ত, তীব্র। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি কিরকম হয়ে গেলাম মালহোত্রা। যশোবন্তী টলে পড়ে যেত, আমি ধরে ফেললাম। কাঁদতে লাগল যশোবন্তী। বলতে লাগল—খুন কর আমাকে তুমি…মেরে ফেল…আমি কলঙ্কিত…

কলঙ্কিত যশোবন্তী? মালহোত্রা, কি রূপসী যে লাগল যশোবন্তীকে। মনে হ'ল, এমনি করে যদি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে যশোবন্তী তাহ'লে তার সব কলঙ্ক ক্ষমা করতে পারব আমি। বল মালহোত্রা, আমি কি কাপুরুষ নই? কি অন্ধ

সত্তা বল আমার···আমি নিজেই নিজের কাছে হেরে গেলাম মালহোত্রা।

সেন সাহেব, তারপর নবল যশোবন্তীকে নিয়ে চলে এল জয়পুরে। স্বামী যে তাকে ক্ষমা করবে তা ভাবেনি যশোবন্তী। তাই সেবায়, যত্নে, স্নেহে, প্রেমে সমস্ত সময় নবলের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিত যশোবন্তী। এক এক সময় মনে হ'ত, সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের রাত বুঝি আসেনি তার জীবনে। সেই তীব্র আলো জ্বলছে সদ্য চূণকাম করা বাংলোর ঘরে। মসলিনের পাঞ্জাবী আর পায়জামা পরে শ্লথদেহে, রক্তচক্ষু কুঁয়ার সাহেব। কিন্তু বড় নিষ্ঠুর এই বাস্তব জীবন। সে রাতটাকে কি ইচ্ছে করলেই অস্বীকার করতে পারে যশোবন্তী? কখনো কখনো মাঝরাতে দেখেছে নবল জেগে উঠে চেয়ে আছে তার দিকে। অদ্ভুত, বিজাতীয় একটা বিদ্বেষ তার চোখে। দেখে চাবুক খেয়েছে মনে মনে যশোবন্তী। তাদের সযত্নে গ'ড়ে তোলা সুখশান্তির দিন ক'টা ভেঙ্গে চুরে গিয়েছে এক নিমেষে।

এই দ্বন্দ্ব আর বিদ্বেষের মধ্যেই জন্মাল যশোবন্তীর ছেলে। ছেলে মানেই বংশধর। উৎসব পড়ে গেল ঠাকুর সাহেবের বাড়িতে। যশোবন্তী খুব কষ্ট পেয়েছিল, বাঁচবার আশা ছিল না। কিন্তু তাকে দেখতে এল না নবল। যখন জ্ঞান হ'ল, যশোবন্তী প্রথমেই খুঁজেছিল নবলকে। কিন্তু কোথায় নবল? জয়পুরের বাড়ি বন্ধ। নবল চলে গিয়েছে বোম্বাই। সব বুঝে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল যশোবন্তী। আর সেদিনই খবর নিয়ে এল শ্যামগড়ের একজন কর্মচারী, ছেলের জন্যে এক লাখ টাকা দিচ্ছেন কুঁয়ার সাহেব। বৃত্তি ঠিক করে দিলেন মাসে পাঁচশো টাকা।

নবল ফিরল তিন মাস বাদে। বদলে গিয়েছে একেবারে। মদ খাচ্ছে, অশ্লীল রসিকতা করছে, রূঢ় আর রুক্ষ কথাবার্তা।

অথচ যত ঘৃণা তার যশোবন্তীর ওপর। ছেলেটার ওপর আক্রোশ হলেও বুঝতুম।

সব কথা আমাকে বলল নবল। বলল, সে যশোবন্তীকে ছাড়তে পারছে না, নিজেও সজ্ঞান হতে পারছে না। তাই তার আচার, আচরণ একান্ত কাপুরুষের মতন। আর রোজগার? ছেলের জন্যে যে টাকা আসে, তা সে ছোঁয় না। তার বাপের যথেষ্ট টাকা আছে।

শুনে আমি তাজ্জব বনে গেলাম। লজ্জিত হলাম। নবল বলল—দেখ, আমি এত অত্যাচার করি, একটা কথা বলে না ও। ওর যদি দোষ দেখতাম······তা'হলে আমার ব্যবহারের যুক্তি থাকত। ও শুধু বলে—তার চেয়ে আমাকে মেরে ফেল। আমি একটা কাপুরুষ মালহোত্রা।

আমি বললাম—আমি যদি তুমি হতাম নবল, তাহ'লে যশোবন্তীর থেকে দূরে থাকতাম। কেননা, একটা কিছু বে-পরোয়া করে ফেলবার সময় ছিল তখন। এখন দেরী হয়ে গিয়েছে। আমার ত' তাই মনে হয়। শুনে উঠে এসেছিল নবল।

সেই রাতেই আমরা চলে আসব সব ঠিকঠাক। হঠাৎ যশোবন্তীর আর্ত চীৎকার শুনে ছুটে গেলাম। বিষ খেয়েছে নবল। আমি একমাত্র ডাক্তার আশেপাশে ক-মাইলের মধ্যে।

আমি আর যশোবন্তী প্রাণপণে যুঝলাম সেই রাতে। যশোবন্তীকে আমি বললাম—শক্ত হ'তে হবে মিসেস দেবনাগ, এই সময় আপনাকে ত' ভেঙে পড়লে চলবে না।

—কেন? ওঁর কি আপনি খারাপ অবস্থা দেখছেন?

—সিরিয়াস ···বলে কথা আমার হারিয়ে গেল। যশোবন্তীর চোখে পলকে একটা মরিয়া আশার ছায়া খেলে গেল। দেখে আমার করুণা হল। তারপরেই আশঙ্কা হ'ল। নবলের মৃত্যুতে

যশোবন্তী যদি মুক্তি পায় হাজার বিড়ম্বনা থেকে, তাহ'লে আমি খুশী হব? ছি, ছি, আমি না ডাক্তার? বললাম—এখনো কিছু বলব না। দেখি...

ভোরে তাকে আনলাম বম্বে। বিপদটা কাটল সেই রাত্রেই। তবু নার্সিংহোমে রাখলাম সাতদিন।

সাতদিন ধ'রে যশোবন্তীকে নিয়ে বম্বের দ্রষ্টব্য সব জায়গা দেখালাম ঘুরে ঘুরে। খুব ভালো লাগছে ওর বুঝলাম। নবলও বলত—মালহোত্রার সঙ্গে যাও না যশোবন্তী···ঘুরে এস। চৌপাট্টিতে ঘুরতে ঘুরতে চামেলীর বেণী কিনে দিয়েছিলাম মনে পড়ছে। মাথা নিচু করে স্মিত হেসে চুলে বেণী পরছে যশোবন্তী, দেখতে আমার খুব ভাল লেগেছিল সেন সাহেব।

যে যশোবন্তীকে হাসতে দেখলে আমি অনাত্মীয় আমারই ভাল লাগে, তার এতটুকু হাসিমুখ সহ্য করতে পারত না নবল। একটু ভাল হয়ে উঠতেই গালাগালি শুরু করল। আবার যশোবন্তী গুটিয়ে নিল নিজেকে। নবলকে দেখে শুনে আমার মনে একটা ভয় হল। হয়তো ওর ম্যানিয়া দাঁড়িয়ে যাবে। সমস্ত ব্যাপারটাই ত' বিশ্রী! যশোবন্তী পরে সেই রাতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল সেন সাহেব। স্পষ্ট বলল—নবল যে ছেলেটাকে ভালবাসে, তার কারণ হচ্ছে, ও বোঝে যশোবন্তী ঘৃণা করে ছেলেটাকে। তাই ছেলেটাকে ভালবেসে ও যশোবন্তীর ওপরই শোধ তোলে। এ যদি দু'দিনের ব্যাপার হ'ত ত' সইতে পারত যশোবন্তী। কিন্তু সারাজীবন ধ'রে এই জোড়াতালি টেনে চলা কি সম্ভব? আর এখন শুধু নবলকে ভরসা করে দেশে ফিরতে ভয় পায় যশোবন্তী। কি করে বসবে তার ঠিক কি! আমি যদি সঙ্গে যাই, তবে ভরসা পাবে যশোবন্তী। আমি বললাম—আমার সঙ্গে ক'দিনের চেনা তার? আমি তাকে ভরসা দেব? যশোবন্তী বলল—সমস্ত জীবনটার ইজ্জত তার চলে গিয়েছে। এখন খড়কুটো ধরেই বাঁচতে চায় সে। তাছাড়া,

নবল ত' আমার বন্ধু। তাকেই বা আমি ছাড়ব কি করে? যদি সে আবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে? আড়চোখে তাকালাম। শাদা রেশমের শাড়ির ফাঁকে চোলি অনাবৃত করেছে গৌর দেহের খানিকটা। গলায়, কানে, হাতে হীরে জ্বলছে। কী আকর্ষণ! চোখে জল নেই। বললাম—আমি রাজী আছি। আমার হাতটা একটু চেপে ধরল যশোবন্তী। উষ্ণ, স্বেদাক্ত হাত। তারপর চলে গেল ত্বরিতে। আমার মনে হ'ল, যদি কুঁয়ার সাহেবের স্মৃতি এতই ঘৃণিত যশোবন্তীর কাছে, তবে তাঁর উপহারের গহনাগুলোই বা কেন পরে থাকে সে?

গাঁয়ে পৌঁছিয়ে কি হয়েছিল, তা আপনাকে বলেছি সেন সাহেব। নবলের বাবা, মা ছেলের মনকষ্ট বুঝেছিলেন। তাঁদের চোখে যশোবন্তীর কোন দোষ ছিল না। তা ছাড়া আমিও ভেবেছিলাম, যদি নবলকে কোনমতে সুস্থ করে তুলতে পারি—মানসিক বিকারটা কাটাতে পারি—সুখী করতে পারি পরিবারটাকে। সেন সাহেব, আপনি কি বলবেন সে আমার অহমিকা? আমি বলি মূর্খতা, আর আমি তারই দাম দিচ্ছি বিশ বছর ধ'রে। বেশ ভাল ছিল নবল, আমার কাছে বলেছিল যে, সে ভাল করেই বুঝছে নিজেকে এমনি করে নষ্ট করে কোন লাভ নেই। এবার সে সুখী করবে যশোবন্তীকে।

কিন্তু বড় ভয়ঙ্কর নেশা। আত্মনিপীড়ন, আত্মনিগ্রহ, করুণা, আকর্ষণ আর ভালবাসা প্রত্যাখ্যান, এর একটা বেড়াপাক আছে। তার মধ্যে যে পড়েছে, সে ত' বেরিয়ে আসবার পথ ভুলে গিয়েছে। একেই বলি আমি ভূতে পাওয়া। নিজের ভূত নিজেরই ঘাড়ে চেপে বসল নবলের। যে মরফিয়া খুব বেশী প্রয়োজন ছাড়া খাবে না—তাই সে খেয়ে বসল। তারপরে সেই রাতের কথা ত' আপনাকে বলেছি। আমি আর যশোবন্তী। পাশের ঘরে মরছে নবল। যত মরিয়া হয়ে উঠেছে যশোবন্তী, তত সুন্দর

দেখাচ্ছে তাকে। দশজন পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এত সুন্দরী হয়ে ওঠে মেয়েরা !

সেনসাহেব বললেন—তারপরে এই আপনার সঙ্গে দেখা ?

—দেখা আর হল কোথায় সেনসাহেব ? আসল কথাই ত' বলিনি। সেদিন চলে এলাম বটে, কিন্তু যশোবন্তীকে ভুলতে পারলাম না। জয়পুরে এসে অপেক্ষা করলাম, যদি কোন খবর দেয় যশোবন্তী। নবলের জন্যেও তো আমার কথা মনে হতে পারে তার। কোন খবরই মিলল না।

এক বছর কেটেছে। আমি বম্বের সেই নার্সিংহোমেই ঘষ্‌ছি। হঠাৎ সকালে হৈ হৈ করে ঘরে ঢুকল নবল। দেখে যা আশ্চর্য হলাম, আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। নবলের স্বাস্থ্য ফিরে গিয়েছে, সুন্দর হয়েছে, ঝলমল করছে চেহারা। বলল—মালহোত্রা, তুমি আমার জন্যে যা করেছ, তার প্রতিদান ত' দিতে পারব না। আজ তোমাকে ধরে নিয়ে যাব···যশোবন্তী গাড়িতে বসে আছে। —আবার যশোবন্তী ? বললাম—নবল, এখন নয়, সন্ধ্যার আগে নয়, অপারেশান আছে একটা।

সন্ধ্যার পর একাই এল নবল। বলল—গল্পটার শেষটা তোমায় শুনতেই হবে মালহোত্রা।

শেষটা কি জানেন সেনসাহেব ? আমি চলে আসবার পরই নবলকে যশোবন্তী বলেছিল, তাকে ত্যাগ করতে। বলেছিল, আর একবার বিয়ে করুক নবল, তাকে ছেড়ে দিক।

কুঁয়ার সাহেবের খবর এসেছে বুঝি ? রূঢ় ভাষণে বলেছিল নবল। যশোবন্তী বলেছিল, শ্বশুরের ইঁদারায় গভীর জল আছে, তার আর ভাবনা কি ? মরে যেতে রাজী আছে, যদি নবল সুখী হয়।

তখন একটা বেপরোয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নবল। কাউকে না জানিয়ে গিয়েছিল শ্যামগড়। দরবারী নিয়ম মানতে গেলে

কুঁয়ারের সঙ্গে দেখা হত না তার। তাই সন্ধ্যাবেলা ঢুকেছিল চট করে কাঁচঘরে। অতর্কিতে তাকে ঢুকতে দেখে চমকে গিয়েছিলেন কুঁয়ারসাহেব। তিনি রুখে ওঠবার আগেই নবল বলেছিল—সে যশোবন্তীর স্বামী। আর যা যা বলেছিল, সে কথাগুলোর মানে নেই। বোধ হয় বলেছিল কুঁয়ার সাহেবকে সে খুন করতে চায়। খুব নাটকীয় কথাবার্তা সন্দেহ নেই।

গোলমাল শুনে একে একে ছুটে এসেছিল ম্যানেজার, চাকর-বাকর, আমীন, করণ। সুন্দর চেহারার সাহেব একজন, সে বুঝি কুঁয়ারের সেক্রেটারী, সে-ও এসেছিল। তাদের দেখে হতবুদ্ধি কুঁয়ার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন। বলেছিলেন—উইলি, এই লোকটা আমাকে খুন করতে চায়।

মদ্যপানে ঢুলু ঢুলু চোখ, কোমর থেকে সিল্কের পায়জামা খসে পড়বে ভয়ে কর্ড দিয়ে বাঁধা, ফর্সা ও নির্বুদ্ধি মুখখানায় ভয়ের ছাপ, চোখে জল, কুঁয়ার সাহেবকে দেখে হঠাৎ হা হা করে হেসে ফেলেছিল নবল। বলেছিল—আমার হাতে কি অস্ত্র আছে?

নবলের কথা শুনে কুঁয়ার সাহেব ছোট, ঘোলাটে চোখ দুটো পিট পিট করে মনে করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মনে করতে পারলেন না। বললেন—যশোবন্তী? কোন্ যশোবন্তী? আমি শুধু কিশোরীকে জানি······কিশোরী কোথায়?

ম্যানেজার নবলকে পাশের ঘরে নিয়ে বললেন, কুঁয়ার সাহেবের বিমাতার একটি ছেলে হয়েছে। ওয়ারিসান বেড়ে গেল বলে কুঁয়ারের মন খারাপ। তাছাড়া ইদানীং আফিং খান উনি, মাথা সব সময় ঠিক কাজ করে না। অপারেশান করাতে গিয়ে মারা গিয়েছে একটি মেয়ে, তার ভাইরা দুই লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়েছে কুঁয়ারের কাছে। বড় বিপদে আছেন বনবীর সিং। আর একটা কথা কি, কুঁয়ারের অত মনে থাকে না······ভুলে গেছেন—ম্যানেজারের অবিশ্যি মনে আছে···যশোবন্তী দেবীকে

টাকা দেওয়া হয়েছিল······জমি-ও। কেন নবল কি আরো কিছু চায়? তাহলে লিখে আর্জি দিতে হবে। বিবেচনা করবে এস্টেট।

নবল মাথা নাড়ল। বলল—কুঁয়ারের মনে নেই? একদম নয়?

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন ম্যানেজার। বললেন—স্মৃতিশক্তি বড় দুর্বল···যে কারণে কোর্ট থেকে তাঁর গদীর দাবী নাকচ করে দিতে পারে···

একটা অদ্ভুত ধাক্কা খেল নবল। বলল—মালহোত্রা, সেই মূহূর্তেই আমি বুঝলাম কি মূর্খতা করেছি আমি। ভেবে দেখ, মাঝখানে যে রয়েছে বলে আমার আর যশোবন্তীর মধ্যে আড়াল ছিল, সে যশোবন্তীকে মনেই রাখেনি। তার কোন অস্তিত্বই নেই কুঁয়ারের কাছে। সেই প্রথম মমতা হ'ল আমার যশোবন্তীর জন্যে। স্নেহ হ'ল। বল মালহোত্রা, এখন তুমি আমাকে কি বলবে?

যশোবন্তীর কাছে ফিরছি যখন, চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে আমার। সেই যেন আমি প্রথম চিনলাম যশোবন্তীকে। তার দুঃখে নিঃসঙ্কোচে কাঁদলাম আমি, আর মনে হল আমার দুই হাতে ধরি যশোবন্তীকে—সব লজ্জা ঢেকে দিই তার। বল মালহোত্রা, কি যন্ত্রণা পেয়েছে যশোবন্তী, ক'টা বছর ধরে। কুঁয়ার সাহেব অত্যাচার করেছে, তার কলঙ্ককে জয়ধ্বনি দিয়ে পুজো করেছে সমাজ—বলেছে ক্ষেত্রজ-পুত্রের মায়ের সৌভাগ্যের শেষ নেই। আর আমি? আমি করেছি অবিচার।

সেই সন্ধ্যায় নিজের ঘরে ফিরলাম যখন, বুঝিবা আমার চোখে-মুখে এইসব কথা লেখা ছিল। খাটে হেলান দিয়ে পাথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল যশোবন্তী। ঘরে আলো ছিল না। আমি আলো জ্বাললাম। ডাকলাম যশোবন্তীকে—আর আমার বুকের মধ্যে এই প্রথম ভেঙে পড়ল যশোবন্তী।

সেনসাহেব, আমার মনে হল বড় মূর্খ আমি। দেখুন ওদের ভাঙা আপনি থেকেই জোড়া লেগে গেল। আমার ভূমিকাটা কি মূর্খের মত নয়? আরো কি জানেন, তবু আমি গেলাম নবলের সঙ্গে।

গিয়ে দেখলুম, আমি হলাম তৃতীয় ব্যক্তি। যশোবন্তী সংসারে তার নিজের জায়গা খুঁজে পেয়েছে। আমার উপস্থিতি বা অস্তিত্ব সবগুলোই অবান্তর তার কাছে। তাই আর যাইনি। বলুন আপনি, একেবারে ফালতু হয়ে যেতে ভাল লাগে?

সেনসাহেব বললেন—যশোবন্তীর স্বামী এখনও জীবিত?

—নিশ্চয়। স্বামী বেশ নামকরা উকিল। ছেলে পড়ছে সিন্ধিয়া স্কুলে। বড় ছেলে বিলেতে।

—হাসপাতাল?

—কুঁয়ার সাহেবের দেওয়া টাকায়। কি দরকার ওদের সে টাকায় বলুন? বহু টাকা রোজগার করে নবল। কিন্তু আমার কথাটা ভাবুন। সেই থেকে কি হ'ল, না বিয়ে করলাম, না কাজ-কর্মের উন্নতি করেছি—ইন্দোরে ডাক্তারী করি, আপনাদের মত এক্সরে সেল্‌স ইঞ্জিনীয়ারদের মারফৎ কিছু টাকাকড়ি পাই—কি রকম যেন হয়ে গেলাম। আমি একটা মূর্খ, তাই না সেনসাহেব?

ব'লে হাসতে লাগলেন মালহোত্রা। হাসতে লাগলেন ব্যঙ্গের স্বরে। তারপর বিষম খেয়ে কাশতে কাশতে থামলেন।

ট্রেন আসছে। লাল আর সবুজ আলোর বিজ্ঞাপন জ্বলছে মাথার ওপর। তার আলো এসে পড়েছে মালহোত্রার মুখে। করুণ একটা হতাশার ছাপ আঁকা একদা সুদর্শন একখানা মুখ। দেখে সেনসাহেবের মনে হ'ল শেষ হাসিটা যেন কান্নার সুর ঘেঁষে বেরিয়ে গেল।

দুজনে পাশাপাশি চলতে লাগলেন।

সতীরাণীর ঘাট

জমিদারী উঠে গেছে সেই কবে। সরকার তুলে দেবার অনেক আগে। পুরোন মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে একদিনের জমজমাট গ্রামখানা আজও দাঁড়িয়ে আছে। বুড়োহাতীর মতো, অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণ চেহারা নিয়ে। মস্তো জমিদার বাড়ীর একদিকটা ভাঙা স্তূপ। সেখানে স্বচ্ছন্দে সরীসৃপ বিহার করে। শীতের সময়ে চিতাবাঘের ছানাকেও খেলা করতে দেখা গিয়েছে ইতি জনশ্রুতি।

অন্যদিকটা একেবারে অটুট। সেখানেই শশাঙ্ককে আনল অনাদি। অনাদিদের পুরোন লাইব্রেরী, নাটঘর আর ছবির সংগ্রহের কথা শুনে শশাঙ্কই প্রথমে আগ্রহ দেখায়। খুবই উৎসাহী হয়ে ওঠে সে। প্রবাসী বাঙালী ছেলে। অর্থ আছে। তাই মনে রোমান্স-ও আছে প্রচুর।

নাটঘর দেখে কিন্তু হতাশ হলো শশাঙ্ক। ভাঙা শ্বেত পাথরের টেবিল। বিবর্ণ ধূলো ভরা জাজিম। দেওয়ালের গিলটি করা ফ্রেম থেকে বিবসনা বিদেশিনী ব্রীড়ানত মুখে চেয়ে আছেন। স্নানরতা সুন্দরীর দিকে কিউপিড অতর্কিতে শরসন্ধান করছেন। বিবর্ণ ক্যানভাস। রং খ'সে পড়েছে।

একটি ছবির সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল শশাঙ্ক। কলসী কাঁখে একটি ষোড়শী মেয়ে, ঘাটে এক পা আর জলে এক পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। তেলরঙের ছবি। ফিকে হয়ে এসেছে। তবু বুঝতে ভুল হলো না মেয়েটির মুখ আশ্চর্য সুন্দর। পাটি পেতে চুল বাঁধা। কানে মাকড়ি। গলায় সোনার মুড়কি মালা। ছবির নিচের দেওয়ালে সিঁদুরের কৌটা। কাগজের ফুলের মালায় ছবিখানা

জড়ানো। ছবিটিতে কোন মোহিনী যাদু আছে। শশাঙ্ককে অদ্ভুত আকর্ষণ করলো।

অনাদি বললো—এঁরই নাম সতীরাণী, আর এই সতীরাণীর ঘাটে-ই আজও মেয়েরা পুজো দিয়ে যায়। এখনতো চাষা গ্রাম। চাষী ঘরের মেয়ে বৌ-রাই আসে। ভাগীরথী সরে গিয়েছে ঘাট থেকে। এই সতীরাণীর পয়ে-ই না কি আমাদের বংশের সৌভাগ্য। এই ভাঙাবাড়ীও যে মাড়োয়ারী কিনে নিচ্ছে, তাও সৌভাগ্য বলেই ধরতে হবে।

রাতে শশাঙ্ক বিশ্রাম করতে গেলতে তলার ঘরে। নামেই তিনতলা। এদিকে নিচু ঘর। সামনে ঝুলবারান্দা। ও পাশে একটি বারোমেসে শ্বেতচাঁপার গাছ আছে। বাতাসে তার গন্ধ এলো। এই ঘরটি ভালো তাই অতিথিকে দেওয়া হলো। ফরাস বিছানা পাতা। কাঁসার গ্লাসে জল। হাতপাখা, কুচোনো সুপুরির নিখুঁত আয়োজন।

এতক্ষণ অবধি তবু গুমোট ছিল। বৈশাখ মাসের শুক্লাতিথি। সহসা বাতাস উঠলো হু হু করে। সেই কত কত দূরের মাঠ আর বন পেরিয়ে ধানক্ষেতের উপর দিয়ে বাতাসটা ছুটে এসে শশাঙ্কের ঘরখানাকে এলোমেলো করে ফেললো এক নিমিষে।

অনাদি বলেছে এ বাড়ীর গল্প বলতে পারেন একজন। তিনিই আসবেন কাজ মিটিয়ে। রাত বাড়লে।

এই ঘর না কি একদিন সেই মেয়েটির ছিলো। এখন শুয়ে শুয়ে তার কথা মনে করতে খুব ভালো লাগলো শশাঙ্কর। বিবর্ণ রঙের টানে আঁকা একখানা সুন্দর মুখ, না জানি মানুষটি কি রকম ছিলো। এই ঘরখানায় তার সেই সব সাধ কামনা ছড়িয়ে আছে। যদি অন্তর থেকে চাওয়া যায়, তবে সে কি আর একবার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে না? ফিরে আসে না আর একবার? এমনি জ্যোৎস্না ধোওয়া বাতাস বওয়া নিশুত রাতে?

এমন নিঃশব্দে ঢুকেছেন মহিলা, যে চমকে উঠলো শশাঙ্ক। সুন্দর চেহারায় আভিজাত্য। সাদা ঢাকাই শাড়ীতে ঘোমটা টানা। একটু হাসলেন। বসলেন টুল টেনে। নমস্কার করলো শশাঙ্ক। বললো—

—ওরা শুয়ে পড়েছে ?

—অনাদি, সীতা আর নিতাই তো ? হ্যাঁ, ঘুমিয়েছে। নইলে কি আর আসতে পারি ?

—সবাই ঘুমিয়েছে ?

ঘাড় নেড়ে জানালেন মহিলা। ইনি যে কে, তা জানে না শশাঙ্ক। সম্ভবতঃ অনাদির কাকীমা হবেন। আবার সুন্দর হাসলেন মহিলা। বললেন—এ সব গল্পগাথার ভাঁড়ারী হয়ে আমি বসে আছি। কেউ-ই শুনতে চায় না।

আলোকে পিছনে রেখে বসলেন মহিলা। এতক্ষণে তাঁর চেহারার সঙ্গে এই নৈশপ্রকৃতির যেন কিছুটা মিল হলো। রহস্য নামলো তাঁকে ঘিরে। মুখখানা আড়াল হলো। কথাগুলো সুন্দর হয়ে ঝরে পড়তে লাগলো। আস্তে আস্তে প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো কাহিনী।

একশো চল্লিশ বছর আগেকার কথা। এই রায়বাড়ীর তখন জমজমার শেষ নেই। রায়েদের জমিদারী রাখবার নীতিই হচ্ছে দাপট আর শাসন। সত্যি বলতে কি তিন পুরুষেই এত কান্না জমে উঠেছিল, যে রায়বাড়ীর ইটগুলোর ভেতর থেকে সেই শব্দ যেন শোনা যেত। মানুষের অভিশাপের যদি কোন শক্তি থাকে তো রায়বাড়ীর ভিত কবে ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতো। কিন্তু জমিদার প্রতাপরুদ্র রায় বড় কড়া লোক। তাঁর ভয়ে কান্নাগুলো সোচ্চার হয়ে উঠতো না। অভিশাপ হয়ে ভিতটাকে ভেতরে ভেতরে ভাঙছিল। খাক করে দিচ্ছিল অন্তঃস্থল।

ওদিকে তখন কলকাতায় রামমোহন রায়ের দল সমাজ

সংস্কারের ঢেউ তুলেছেন। প্রতাপ রায় ছিলেন নব্যদলের বিরোধী। তাঁর গাঁয়ে ইংরেজী তখনো ঢোকেনি। সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিলো সামান্য। কেন না তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে অন্য কোন শক্তিকে চোখেই দেখতেন না, অর্থাৎ স্বীকার করতেন না। তবে দারোগা এলে তাকে খুশি রাখবার ব্যবস্থা থাকতো।

তাঁর ইচ্ছেতে সূর্য চাঁদ উঠতো না বা অস্ত যেতো না বটে। তবে আর সবই হতো। অন্ততঃ তাই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

তবু আসল জায়গাতেই ঠেকে গিয়েছিলেন প্রতাপ রায়। বাইরের কেউ নয়, ঘরের শত্রু নিজের বিভীষণ ভাইপো ভবানীশঙ্করই ঠেকিয়েছিলেন তাঁকে। ভবানীশঙ্করের বয়স পঁচিশ। প্রতাপ এবং তাঁর শরীরে একই রক্ত প্রবহমান। তবু মাঝখানে এক পুরুষের ব্যবধান। ভবানীশঙ্কর বেপরোয়া দুঃসাহসী, জেদী। তবু তাঁর রুচি এবং শিক্ষাদীক্ষা বিভিন্ন। ফারসী পড়তে পড়তে ইংরেজী শিখেছিলেন জোর করে। ছবি আঁকবার বাতিক হয়েছিলো কলকাতা ঘুরে এসে। সংসারে তাঁর ভালবাসবার মানুষ ছিলেন জ্যাঠাইমা নারায়ণী। সেদিন স্বগ্রামে প্রতাপের যা পদমর্যাদা, তাতে নারায়ণীকে পাটরাণী বলা চলে। নারায়ণী-ই প্রতাপের প্রথম স্ত্রী। কান্দীর বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। আত্মাভিমানী, শিক্ষাদীক্ষা-ই অন্য রকম।

ভবানীকে এক বছরের রেখে তাঁর মা স্বামীর অনুমৃতা হন। বিদেশে মারা যান ভবানীর বাবা— তীর্থ ভ্রমণকালে। নারায়ণীর কাছেই মানুষ হলেন ভবানী। গোঁড়া ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে হয়েও ভবানীর মায়ের অনুমরণকে কিছুতেই অন্তর থেকে সমর্থন করতে পারেননি নারায়ণী। মনে হয়েছিলো ধর্মের নামে এ হত্যা। স্বামীর ভূমিকা খুবই প্রবল ছিলো। তাই প্রতাপের সম্পর্কেও তাঁর মনে সেদিন থেকেই অভিযোগ জমা হয়েছিল।

ভবানীর সঙ্গে তাঁর অন্তরের একটা যোগাযোগ গড়ে উঠলো।

তাঁর সমর্থনই ভবানী কলকাতায় গেলেন ইংরেজী শিখতে। কাশিমবাজারের পাদরী সায়েবের সঙ্গে যাতায়াত আর আলাপ পরিচয় সম্ভব হলো। অন্যায়কে অন্যায় বলে প্রতিবাদ করতে বাধলো না ভবানীর। প্রতাপ রায়ের আচরণকেও সমালোচনা করতে সুরু করলেন তিনি।

ভবানীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন বলে দুইবার বিয়ে করলেন প্রতাপ্। একটি সন্তানও হলো না। মাঝখান থেকে ভবানীর সঙ্গে আবার বিরোধ লাগলো। ভবানীর প্রত্যেকটি আচরণের পেছনে নারায়ণীর প্রত্যক্ষ সমর্থন দেখতে পেলেন প্রতাপ।• দেখে তাঁর ঠোঁট আরও চেপে বসলো। কপালে আর একটা রেখা পড়লো। এই একটা জায়গায় তাঁর পরাজয়। প্রতাপ কেন সে পরাজয় স্বীকার করেন, অনেকের কাছেই তা দুর্বোধ্য। সম্ভবতঃ অন্তরের-ও অন্তরে কোন আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন প্রতাপ, যে হ্যাঁ প্রতিপক্ষ তাঁরই যোগ্য। ভবানীর ও তাঁর শিরায় শিরায় একই রক্ত বইছে।

এরই মধ্যে এক ঘটনা ঘটলো। জলঙ্গীর ওপাশে বিলের জমি বন্দোবস্ত করতে গেলেন ভবানী। কাজ ত' যৎসামান্য। এখানে আবহাওয়া অনেক অন্য রকম। শিকার করা, স্বচ্ছন্দ ঘুরে বেড়ানো, কোন বাধাই নেই। এত ভাল লাগলো ভবানীর, যে গ্রামে ফিরতেই ইচ্ছা হলো না। এমনি সময় একদিন সন্ধ্যার মুখে বিলের পাশ দিয়ে আসছেন ভবানী, সহসা দাঁড়ালেন। এ পথ দিয়ে কেউ চলাফেরা করে না। তাই জেনেই হয়তো মেয়েটি নিঃসঙ্কোচে উঠে আসছে জল থেকে। চুলের মতো সূক্ষ্ম ঝাঁজি দামে জল সবুজ। তারই এতটুকু পরিষ্কার করে ব্যবহারের মতো করে নেওয়া হয়েছে। খেজুর গুঁড়ির ঘাটলা। তাতে এক পা আর জলে এক পা রেখে উঠছে মেয়েটি। পাটি পেতে খোঁপা বাঁধা। হাতে গলায় গহনা নেই। বেগুনফুল রঙের শাড়ীতে

চিকন কাল পাড়। ভবানী জানেন এমন কাপড় গাঁঠ বেঁধে দিয়ে যায় তাঁতি তাঁদের বাড়ী ফি নতুন বছর, পুজো বা অন্য পালপার্বণে। নারায়ণী দাসীদের এই সব কাপড় বিলি করেন। এই মেয়েটির পরনে সেই সামান্য শাড়ীই কেমন সুন্দর মানিয়েছে। অতি সুডোল সুন্দর মুখ। শাঁখের মতো মাজা রঙ। টানা চোখের প্রান্ত যেন একটু ওপর পানে তোলা। তাতে মুখখানিতে একটা প্রতিমার মতো ভাব এসেছে। কাঁধে পাট করা গামছা। কাঁখে পেতলের কলসী। কাছেভিতে কেউ আছে বলে জানে না মেয়েটি। গাছপালার ছায়ায় সবুজ পথ দিয়ে সে যেদিকে গেল সেদিকে কোন্ মানুষের বসতি?

খবর নিতে দেরী হলো না ভবানীর। মেয়ের নাম সতী। গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ে। কুলীন ঘরে এমন মেয়ে কতো অবিবাহিত থাকে। তাই আঠারো বছরেও সতীর বিয়ে হয়নি। সতীর বাপ দাদা ভবানীদেরই কাছারীর কর্মচারী।

চোখে দেখতে এমন ভালো লেগেছিল, যে পরদিনও এলেন ভবানী। খুব ভোরেই এলেন। সবে শরতের সুরু। বিলের কানায় কানায় জল। কাশ ফুলের ঝোপ ভরে উঠেছে। বিলের যে দিকটা গাঁয়ের পাশে পড়েছে সেখানে এখন মেয়ে বৌ-রা স্নান করে। ছেলেরা মাছ ধরে। এদিকে ঘন জঙ্গল। বসতি নেই। বড় জোর রাখালরা গরু মোষ নাইয়ে নিয়ে যায়।

ভোরের রাঙা আলোতে মেয়েটি আজও ঘাটে এসেছে। বাসন মেজে রেখেছে ঘাটে। কাপড় কেচে রেখেছে। ছোট একটি ডালা ভরে কলমী শাক তুলেছে সযত্নে। ঘাট থেকে উঠতেই ভবানীকে চোখে পড়লো আজ। বিস্ময় আর লজ্জায় লাল হয়ে এক মুহূর্ত যেন স্থির হয়ে রইলো সতী। তারপরই তাড়াতাড়ি করে চলে গেলো।

ইচ্ছে ছিলো বলেই বোধ হয় দেখা হলো বারবার। কি ব্রত

করে বাড়ী বাড়ী পুজোর প্রসাদ দিয়ে ফিরছিলো সতী আরো মেয়েদের সঙ্গে। ভবানী তাঁর পাইকদের সঙ্গে গ্রামের সম্পন্ন কোন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রাখতে চলেছেন। দু'জনে মুখোমুখি হতে সতী লাল হলো লজ্জায়। দুটি হাত জোড়া। মুখ নামিয়ে চলে গেলো ভিন্ন পথে।

নিজে থেকেই আলাপ করলেন ভবানী একদিন। আশ্বিন মাসে কখনো কখনো এ অঞ্চলে ঝড় ওঠে। ঈষৎ বৃষ্টির ঝাপটা আর ঝোড়ো বাতাস। সুরু হলে তিন চার দিন একরকম কাটে। এমনি এক মেঘলা বিকেলে জল নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরছিলো সতী। পথ আটকে দাঁড়ালেন ভবানী। বললেন—রোজ রোজই চলে যাবে? একদিনও দাঁড়াবে না? কথা বলবে না?

প্রতাপ রায়ের উত্তরাধিকারীর সঙ্গে কথা কইতে সম্ভ্রমে লজ্জায় গলা বন্ধ হয়ে এলো সতীর। বাবার কঠোর কথাগুলি মনে পড়লো। এদের কাছে ক্ষণিকের ভালো লাগাটুকুই বড়ো। এদের বাড়ীতে সম্মান করে নিয়ে যাবে না কোনোদিন সতীকে। প্রতাপ রায়ের নিঃশ্বাসে এমন কিছু আছে যাতে সুখশান্তি শুকিয়ে যায় তাঁর পরিবারের। বেশী কথা কি, প্রতাপ রায়ের তৃতীয়া স্ত্রী সরোজবাসিনী সতীর মায়ের বুঝি কি রকম বোন হন। শুনেছে দুই মাইল দূরে পিত্রালয়। তবু পাঁচ বছরে একদিনের জন্যেও রায় বাড়ী থেকে বেরুতে পারে নি সরোজবাসিনী। প্রতাপ রায়ের ভাইপো ভবানী নাকি পাগল। সে ওই দুর্ধর্ষ জ্যাঠা-মশায়কেও মানে না।

তবু ভবানীকে দেখে ভয় হলো না সতীর। প্রথম বিভ্রম কাটতে অল্প অল্প করে চেয়ে দেখলো। ভবানী আবার কথা কইলেন।

আলাপ থেকে পরিচয়। আপনি থেকে তুমি। ভোরে জল নিতে আসে সতী। তার ছবি আঁকতে সুরু করলেন ভবানী।

এ ঘনিষ্ঠতার কথা জেনে বিব্রত হলেন সতীর বাবা। তাঁকে ভরসা দিলো ভবানী। জানালেন তিনি বিয়ে করবেন সতীকে।

এদিকে মহাপূজার দিন এলো। নারায়ণীর সনির্বন্ধ অনুরোধ নিয়ে লোক এলো। এমন দিনে কি বাড়ীর ছেলে বাড়ী ছেড়ে দূরে থাকে?

পুজোর ভিড় মিটতে নারায়ণীকে সব কথা খুলে বললেন ভবানী। নারায়ণী মনে মনে খুশি হলেন। মুখে বললেন—সুন্দর মেয়ে না হলে আমি কর্তাকে কিছু বলতে পারব না।

বিল্ববাসিনী আর সরোজবাসিনী দুই বৌয়েরই রূপের গর্ব ছিলো। নিঃসঙ্গ নিরানন্দ জীবনে ভবানীর বিয়ের কথাতে তাঁদেরও আনন্দ হলো। সরোজবাসিনী বললেন—এমন বৌ আনবে, যেন ঘর সেজে ওঠে।

তখন ভবানী নারায়ণীকে ছবিখানি দেখালেন। তিনজনে ছবি দেখে মুগ্ধ হলেন। প্রায় সমবয়সী ছেলে ভবানী। তাঁকে ঠাট্টা করে সরোজ বললেন—ছবি এঁকে এনেছ? এমন কথা-ও ত কোথাও শুনিনি।

—এ যেন গল্পকথা হয়ে গেল।

সত্যিই ত' গল্প কথা। এমন কাহিনী তাঁদের ঘরে শোনা যায় না। এরকম ঘটে বটে বাগদী দুলে পাড়ায়। উদ্ধব বাগদীর বিধবা মেয়ে হারাণীর হাত ধরে নিরুদ্দেশ হয় নিতাই পাইক। জলঙ্গীর চরে ঘর বাঁধে। হারাণীর লাঠিয়াল বাপ ভাই দল বেঁধে লড়তে আসে। নিতাইয়ের রক্তে লাল হয় জলঙ্গীর জল। সেই দুঃখে পাগল হয় হারাণী। একপিঠ চুল এলিয়ে দিনের বেলা বাতি হাতে খুঁজে বেড়ায় নিতাইকে। এই দুঃখের কাহিনী অন্তঃপুরে নিয়ে আসে গঙ্গা-নাপতিনী। মেজ বৌ ছোট বৌয়ের ফর্সা পা-য়ে আলতা পরাতে পরাতে বলে। শুনে শুনে মনে রোমাঞ্চ হয় সরোজবাসিনী বিল্ববাসিনীর। ছেলে নেই, মেয়ে

নেই—ঘরের কোন আকর্ষণই নেই। ঘরের বাইরে কতবড় তুনিয়া। মাঠে ঘাটে নদীতে চরে কত কি ঘটে। কত আনন্দ সেখানে, কত তুঃখ সেখানে, কত প্রাণ!

ভবানীর আর সতীর কথা জেনে তাই তাঁদেরও আনন্দ হলো। মনে হলো এরা সুখী হোক। ঘরে নতুন মানুষ আসুক।

প্রতাপকে বিয়ের কথা বলতে পারেন এক নারায়ণী। তিনিই তুললেন কথাটা। বললেন—

—সে মেয়েকে ভবানী দেখেছে। তার পছন্দ হয়েছে। এখানে নইলে বিয়ে করবে না ছেলে।

যার বিয়ে সে-ই পছন্দ করে এসেছে মেয়ে? এ কোন্ দেশী আচরণ? অবশ্য ভবানীর সবটাই তুর্বোধ্য প্রতাপের কাছে। একটা কেন, দশটা বিয়ে করুক না কেন ভবানী। তবে কোথাকার কে মেয়ে, তাকে জানেন না প্রতাপ, স্ত্রীর কথা শুনেই মত দিতে রাজী হলেন না।

শেষ অবধি প্রতাপ রায়ের নির্বাচিত ঠাকুরমশাই গেলেন। মেয়ে দেখে এসে তিনি জানালেন—মেয়ে যেন পূর্ণিমার চাঁদ। যেমন সুন্দরী, তেমনই সুলক্ষণা। এ মেয়ে ঘরে এলে বংশের পরম গৌরব হবে।

শেষ অবধি প্রতাপ রায় যা করলেন তাতে অবশ্য কলঙ্কের অন্ত রইলো না। তখন এরকম হামেশা ঘটতো। আজ-ও ক্বচিৎ শোনা যায়। তাতে-ও কলঙ্ক হয়। এই কলঙ্ক যে আনে সে মহাপাপী।

অঘ্রাণের মুখে যখন ওদিকেই কাছারী দেখতে বেরোলেন প্রতাপ রায়, নারায়ণীর-ই অনুরোধ ছিলো সতীকে দেখে একেবারে আশীর্বাদ করে আসতে হবে। অগ্রহায়ণেই দিন দেখে বিয়ে হবে।

কোন্ রাহুর দৃষ্টি ছিল সেই লগ্নের ওপর কে জানে। সতীকে

দেখে প্রতাপের বিভ্রম হলো। রূপের আকর্ষণ দুর্নিবার। তিনি যা করতে চলেছেন তা ঘোর অন্যায় জেনেও কিছুতেই নিজেকে ফেরাতে পারলেন না প্রতাপ। ভবানীর কথা দূরে গেল। নিজেই বিয়ে করলেন সতীকে। ঠাকুরমশাই কাশীর ভৃগুমণ্ডলীর অব্যর্থ গণক। তাঁর কথাগুলি-ও তাঁকে কম বিচলিত করেনি—এই মেয়ের থেকেই নাকি তাঁর বংশের নাম থাকবে! মনে হলো এ-ও বিধাতার আর এক নির্দেশ।

বিয়ের সময় কিন্তু ক'নে বারবার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো। ওদিকে সর্বনাশের খবর পেয়ে নারায়ণী জরুরী তলব পাঠালেন ভবানীকে। ভবানী যখন এসে পৌঁছলেন তখন সব হয়ে গিয়েছে। চরম অন্যায় করেছেন প্রতাপ জেনে শুনেই। এখন আরো অন্যায় না করে বুঝি তাঁর উপায় নেই। তাই তিনি বর্বর হয়ে উঠলেন। এই একটি কাজের ফলে সকলের চোখে ছোট হয়েছেন তিনি। সেই বোধ তাঁকে নিরন্তর চাবুক মারছে। সবচেয়ে পরাজিত হয়েছেন তিনি সতীর কাছে। পরুষ দাবীতে সতীর দিক থেকে কোনো সাড়া পেলেন না। যাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, সে প্রাণবন্ত রূপলাবণ্যের সজীব একটা প্রতিমা। সেই মানুষ যেন মরে গেল। মরে গেল চোখের সামনে। এখন সেই মরা মানুষটাই যেন হীরে মুক্তো পরে তাঁর ঘরে অনড় হয়ে রয়েছে। এ ত তিনি চান নি। ভবানীর সামনে দাঁড়িয়েই বা কি বলবেন প্রতাপ?

ভবানী শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠেছিলেন। নারায়ণীকে সরিয়ে দিয়ে দেওয়াল থেকে শূয়োর গাঁথা সড়কিখানা খুলে নিয়েছিলেন। রায় বংশের উচ্ছৃঙ্খল রক্ত ক্ষেপে উঠেছিলো। সামনে প্রতাপকে পেলে পরে হয়তো রক্ত বয়ে যেতো দু'জনের মাঝখানে। জন্মের মতো ছিঁড়ে যেতো সম্বন্ধ। কিন্তু সামনে পড়ল সতী। প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যার ছায়ায় তার মুখ আরো মলিন দেখাচ্ছে। রক্তহীন সাদা মুখ, সীমন্তে সিঁদূরের নিষেধ, আর লাল কাপড়ের শিথিল

আঁচল। বড় বড় নিষ্পলক চোখে কোনো মিনতি দেখলেন ভবানী, ফিরে এলেন। তার পরদিনই দূরে পদ্মার ধারের চর-আবাদে চলে গেলেন ভবানী।

বাড়ীতে একটা অশুভ ছায়া নামলো। নারায়ণী স্বামীর সঙ্গে কথা বন্ধ করলেন। সরোজ আর বিল্ববাসিনীর সঙ্গেও প্রয়োজন ছাড়া কথা বলেন না। অন্তঃপুরে আসা বন্ধ করলেন প্রতাপ। আরো কি, সতীকে তিনি পরিহার করতে সুরু করলেন। তাকে হাতের মুঠোয় আনা অসম্ভব। তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলো। সতীর চারিপাশে একটা অলঙ্ঘ্য ব্যবধানের স্থির সমুদ্র। মৃত্যু-পুরীতে নির্বাসিতা কোন কন্যা যেন সতী। অপ্রত্যাশিত আঘাতে তার সমস্ত চেতনা বিমূঢ় হয়েছিলো। আবার ধীরে ধীরে জাগলো সে। কিন্তু একান্ত এক অপরিচিত জগতে। দেখলো সকলের থেকে সে অনেক দূরে। এদের জগতের সঙ্গে তার কোন যোগসূত্র নেই। দিন কাটে পুতুলের মতো। কতকগুলো নির্দেশ আর অভ্যাসের অনুশাসন মেনে। রাতকে সতীর বড় ভয়।

প্রতাপ কোনদিন পরুষ হয়ে ওঠেন—

—তুমি হাসতে পারো না? হাসতে পারো না, কথা কইতে পারো না? এত কি দম্ভ তোমার? এত এনে দিয়েছি, তবু তুমি খুশি হতে পারো না?

সতী পাষাণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আবার কোনদিন প্রতাপের গলায় অনুনয় নামে—

আমি এ করতে চাইনি— বিশ্বাস করো ছোট বৌ, ভুল করেছি আমি।

বিশ্বাস করো! এ কথার-ও কোন জবাব দেয় না সতী। শুধু ঠোঁট আর চোখ তার কোনো কথা বলতে চেয়ে একটু নড়ে ওঠে। আবার স্থির হয়। হতাশ ও পরাজিত প্রতাপ তখন বেরিয়ে যান নিচের ঘরে। অনেক রাত অবধি মদ খান আর ভ্রূকুটিল

করে কি যেন ভাবেন। তারপর কোনো এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

তখন সতী একলা রাত জাগে। এক একদিন কোনো অদ্ভুত আকর্ষণে ঘর, বারান্দা, দালান দিয়ে পায়চারি করে বেড়ায়। কত ঘর, কত বারান্দা। একদিন সেই নিশাচারিণীকে দেখে চমকে উঠেছিলেন নারায়ণী। ভবানীর শখে পাঠ শিক্ষা করেছিলেন একদিন। এখন সে শিক্ষা কাজে লাগলো তাঁর। রাত জেগে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করেন নারায়ণী প্রদীপ জ্বেলে। সেদিন-ও পড়ছেন। সহসা মনে হলো কে যেন দ্রুত চলেছে আধা অন্ধকার উঠোন দিয়ে। আশ্চর্য হয়ে নারায়ণী বেরিয়ে এলেন। স্পষ্ট দেখলেন ঘুরে সে গোলাঘরের দিকে চলে গেল। সেই গোলাঘরের পর নারায়ণীর নিজের ফুলবাগান। তারও পরে সুবিশাল পুকুর আর তার পাড়ের পতিত বাগান। মনে হলো অলঙ্কারের রিন্‌-ঝিন্‌ শব্দ-ও শোনা যাচ্ছে, সেই দিক থেকে। সহসা তাঁর আতংক হলো। ছোটবেলার বৌ-কাল থেকে শোনা অনেক কথা মনে পড়লো। ত্রস্তে ঘর বন্ধ করলেন নারায়ণী। সতী বুঝলো নারায়ণী ভয় পেলেন। মনে হলো ভয় পাবারই ত কথা। নিজের সব আশা-আকাংক্ষা যার মরে গিয়েছে, তাকে প্রেতিনী মনে করাই স্বাভাবিক।

এমনি ভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন খিড়কীর পুকুরের পথ চিনলো সতী। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। তাতে আঁধারই একটু স্বচ্ছ হয়েছে। আলো হয় নি। অন্দরের সীমানা ছাড়িয়ে প্রথমে খানিকটা পতিত জমি। তারপর সুরু হলো সুঁড়িপথ আর দুই পাশে ঘন·গাছের ঝোপ। আতা, পেয়ারা, কামিনী, কুর্চি ফুলের গাছ। এ পথে কেউ বোধ হয় হাঁটে না। তাই পথের মাটিতে দুর্বো ঘাস হয়েছে।

আজ দুইমাস ঘাস, মাটি আর গাছপালার স্পর্শ পায়নি সতী। বড় ভাল লাগলো তার। পুকুরের ঘাটে দাঁড়িয়ে মনটা তার

জুড়িয়ে গেল। মাথার উপর খোলা আকাশ, সামনে নিস্তরংগ কালো জল। আশপাশে বড় বড় ছায়াচ্ছন্ন গাছ। মনে হলো এতদিনে যেন মুক্তি পেল সে। দিবারাত্রি চারখানা দেওয়ালের ভেতরে থেকে এই খোলা মেলা জীবনটা যেন একেবারে ভুলতে বসেছিলো সে। জলে পা ডুবিয়ে বসে একবার এই রাত্রির আকর্ষণে মনে হলো জলে নেমে যাই। এই ঠাণ্ডা কালোজলের নিচে হয়তো শান্তি পাবো। তারপর-ই বাঁচবার লোভ হলো। মনে হলো আত্মহত্যা পাপ। আর এখনো ত' ভবানী আছে। যে পৃথিবীতে ভবানী আছে সে পৃথিবী সতী ছাড়তে চায় না।

সেদিন থেকে সতী নিত্য বাগানে যায়। বাইরে কাছারী বাড়ীর বিলিতী ঘড়িতে দুটো বাজলে আস্তে আস্তে নেমে আসে সতী। সমস্তটা দিন তার তিনতলার ঘরে একলা কাটে। রায় বাড়ীর সকলে তাকে জানেও না। মাঝরাতে রায়বাড়ীতে একটি সুন্দরী মেয়েকে এখানে ওখানে ঘুরতে দেখা গেছে, এই কথা মুখে মুখে ছড়াতে সুরু করলো। কোন কোন দিন নাকি বাগানের দিক থেকে মৃদু মৃদু কান্না-ও শোনা গিয়েছে। এদিকে ভবানী ঘর ছাড়া। প্রতাপের দিনের বেলার মূর্তি যেমন রুক্ষ, তেমনি ভয়াল। সবাই তাঁকে সমালোচনার চোখে দেখছে যখন, তখন তিনিই বা বেপরোয়া হবেন না কেন? রাতটাকে নেশায় ডুবিয়ে রাখেন তিনি। ক্রমে দূরের মহালে অরাজকতা দেখা দিল। বাৎসরিক পরিক্রমার পথে কুলগুরু এলেন। দেখে শুনে নারায়ণীকে বললেন বিচলিত হয়েছেন এ বংশের ভাগ্যলক্ষ্মী। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন দরকার। নারায়ণীকে আরো সতর্ক হতে বললেন। নারায়ণী শুনলেন মাত্র। কানে নিলেন না। তাঁর-ও চোখ আছে, কান আছে। পাপ স্পর্শ করেছে সব কিছু। রাতে কে কাঁদে? নারায়ণী জানেন এই বাড়ীর লক্ষ্মী কাঁদেন বিলাপ করে। কোন শান্তি স্বস্ত্যয়নে-ই আর মঙ্গল আনবে না। হয়কে নয় করা সম্ভব হবে না।

শেষে অনেক ভেবে নারায়ণী ভবানীকে চিঠি লিখলেন। জানালেন একবার তিনি তীর্থ দর্শনে যেতে চান। ভবানী ছাড়া তাঁর উপযুক্ত সঙ্গী কোথায় ?

ভবানী এলেন। নারায়ণীকে নিয়ে চলে যাবেন বলেই এলেন। অন্যথায় তাঁর এ বাড়ীতে ঢুকবার ইচ্ছে ছিল না। বাড়ীর ভিতরের বিশৃঙ্খলা তাঁর চোখে পড়লো। নারায়ণী বললেন—ওরা বলে প্রেত, আমি রোজ রাতে কান্না শুনি। বেশ বুঝি কোন অপদেবতা নয়। এ বাড়ীর লক্ষ্মী এই বাড়ীর অন্তরালেই গুমরে গুমরে কাঁদছে, জানলি ? রাতে কান পেতে রাখিস —শুনতে পাবি।

ভবানী হয়তো অন্য কথা সন্দেহ করেছিলেন। মনের দুঃখে নারায়ণী অনেক কথাই বলেন। বলেন— আমার যে মেয়েটি মরে গেল একবছর বয়সে, সতী যে তার চেয়েও ছোট। ওর মুখের দিকে চাইতে পারি না আমি। বুকের ভেতরটা পুড়ে যায়।

একরাতে ভবানী তাই কান্নার শব্দটুকু অনুসরণ করে এলেন। বট, অশ্বত্থ, পিপুল, দেওদার গাছের ঘন ঘন গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে জ্যোছনায় আলো করেছে। শ্যাওলায় সবুজ কালো পাথরের ঘাটের উপরে যেন জ্যোছনায় জমাট বেঁধেছে। হীরে মুক্তোর গহনায় ঝিকমিক করছে আলো। দেখে নিচু হলেন ভবানী। বললেন—কাঁদ কেন সতী ?

আজ কতদিন পরে দেখা। হয়তো চমক লেগে পা-ই পিছলে যেতো সতীর। ভবানীর সংস্কারের কথা মনে রইলো না। ধরলেন সতীর হাত। বললেন—শান্ত হও, বসো। কথা আছে।

বটগাছের বড় বড় ঝুরির নিচে ঘন অন্ধকার। ভবানী সতীকে সেখানে বসালেন। বললেন—সতী সাহস করো, অনেক কথা আছে।

তার পরদিন-ও এলো সতী। তারও পরে আর একদিন।

প্রতাপ জানেন না। কেউ জানে না। পনেরো মিনিট, কুড়ি মিনিট, আধঘণ্টার জন্যে দেখা হয়। ভবানী বলেন—আমি অনেক দেশের মানুষ দেখেছি, বিদেশ দেখেছি। সায়েবদের কাজ নিয়ে চলে যাবো গঙ্গা বেয়ে এলাহাবাদ বা কানপুর। সে সুদূর পশ্চিমের দেশ। যে কাজ করবো, তুমি আর আমি সুখে থাকবো।

অসম্ভব প্রত্যাশা। মৃতকে যেন প্রাণ দেওয়া হবে। সতীর গলায় কথা ফোটে না। ফর্সা গলায় নীল শিরাটা কাঁপে দপ্‌দপ্‌ করে। বলে—কিন্তু কেমন করে হবে?

—কেন সতী?

—ভয় করে।

—ভয় কি সতী? আমার সঙ্গে যাবে তাতেও ভয়?

—কিন্তু···

—কিন্তু নয় সতী। এ বিয়ে আমি মানি না। সেই বিলের ধার। জলে দাঁড়িয়ে দুজনে দুজনকে কথা দিয়েছি, সেই আমাদের বিয়ে। এই অনাচার আমি মানি না।

ভবানী যখন এত ভরসা দিতে পারেন, সতী-ও একটু ভয় হারায়। বলে—বেশ, তারই ব্যবস্থা করো। তাড়াতাড়ি কোর। আমার কেমন ভয় করে।

—কেন?

—রাতে জেগে দেখেছি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বড় রায় যেন কেমন করে আমাকে দেখছে। ওর চোখ দেখলে আমার ভয় হয়।

—নদীতে জল না বাড়া অবধি ত' অপেক্ষা করতেই হবে সতী।

—তার আর কত দেরী?

—অন্ততঃ চার মাস।

সতীর কি যেন মনে হয়। বলে দেখ, তখন কতবার ভেবেছি মরি এই জলে ডুবে। আবার তোমার কথা ভেবে ফিরিয়ে

নিয়েছি মন। ভেবেছি তুমি ত' আছ। তোমায় রেখে মরতে আমি পারব না। তাই বোধ হয় আবার দেখা হলো। এত সুখ-ও হলো। এই সুখ কপালে সইবে ত'? আমার যে শুধু ভয় হয়।

—ভয় করোনা সতী।

ভয়ের কারণ কিন্তু সত্যিই ছিলো। সতীর মন মিথ্যে বলেনি। সতীর ভাবান্তরকে অন্যরা ধরে নিয়েছিলো স্বাভাবিক এক পরিণতি হিসেবে। প্রতাপ বুঝেছিলেন। ভবানীর উপস্থিতির সঙ্গে তার কোন যোগ আছে কি না বুঝতে চেষ্টা করছিলেন। সুযোগ খুঁজছিলেন প্রতাপ।

সুযোগ মিলতে দেরী হলো। অনেক কথাই মনে হয় প্রতাপের। কিন্তু প্রমাণ কোথায়? সব প্রবৃত্তিগুলো মরে ঝরে দাঁড়িয়েছে একটা নগ্ন জিঘাংসায়। ভবানী তাঁর সঙ্গে একটা কথাও কয় না। সম্পূর্ণ নিজের মতো স্বাধীনভাবে থাকে। বিলের ধারের আবাদ অঞ্চল জমা দেওয়া নিয়ে যথেচ্ছাচার করেছে। শ'য়ে শ'য়ে টাকা স্বচ্ছন্দে মকুব করে দেয়। বলে বেড়াচ্ছে—আমি এখন আটআনা অংশের মালিক। সব উড়িয়ে দেবো। কিসের পরোয়া করি? তাঁর বিরুদ্ধে এই চক্রান্তে নারায়ণী সর্বদা পাশে পাশে রয়েছেন। তাঁর ঘরে দানযজ্ঞের ধূম পড়ে গিয়েছে। এরা ভেবেছে কি? তিনি শেষ হয়ে গিয়েছেন? বাইরের কাছারীতে-ই রাতদিন থাকেন প্রতাপ। নেশার ঝোঁকে রাতদিনও কাটে কখনো। মনে শুধু আক্রোশ আর জিঘাংসা গজরায় কালো সাপের মতো। সাপটার দাঁতে খুব বিষ জমেছে। সময় পেলেই ছোবল মারবে। চরের মুসলমানরা সেদিন ছোট রায়ের নাম করে মাছ এনেছিলো। বললো—ছোট রায় রাজা হলে সার্থক মানাবে। ঘোড়ায় চেপে চলে যেন রাজা চলেছে।

সত্যিই আরো সুদর্শন হয়েছে ভবানী। একেবারে বেপরোয়া নির্ভীক। ওর বাবা-ও অমনই ছিলো। বৈমাত্রেয় ভাই। প্রতাপের চরিত্র কারো অজানা ছিল না। তাঁর হাত থেকে ছেলেকে প্রাণপণে আগলে চলতেন সৎমা। এখন প্রজাদের মুখে প্রশংসা শুনে প্রতাপের মনে হিংসা যেন গর্জে উঠলো। ভবানীকে তিনি মর্মান্তিক হিংসা করেন। তার যৌবন আছে, তাঁর নেই। সে আছে নারায়ণীর মহলে। দিনমান বাইরে কাটে তার। বাইরে তাকে দেখেন প্রতাপ। অন্দরে এসে দেখেন সতীকে। সতীকে বিয়ে করবার জন্যে নিরন্তর শাপ দিচ্ছে তাকে সতী, তা কি তিনি বোঝেন না? তাঁকে সে ঘৃণা করে। তাকে তিনি নিষ্ফল করলেন। বাড়ীর পোষা একটা পাখীকে একদিন অমনই জান্তব আক্রোশে মেরে ফেলেন প্রতাপ। দেখে সতী হাসলো। তাঁকে করুণা করলো। তিনি যা ছোঁবেন তা-ই যে নষ্ট হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে এ কথা সেই হাসিতেই পরিস্ফুট হলো। সতীকেই কি তিনি কম ঘৃণা করেন? এই দুজন তাঁর পরম ঘৃণার পাত্র। সম্প্রতি এদের মধ্যে একটা জিনিস দেখেছেন প্রতাপ। যেন তাঁকে উপেক্ষা করেও বাঁচছে এরা। ভবানীর গলায় আবার সেই হাসি প্রায়ই ফেটে পড়ে নারায়ণীর মহল থেকে—শুনতে পান তিনি। আর সতীর নিস্পৃহা ও নির্লিপ্তি কোথায় গেল? জীবনে আকর্ষণ এসেছে তার। সেই তিনতলার একখানা ঘর আর বারান্দায় ঘুরে ঘুরেই দিন কাটে তার। কিন্তু নতুন করে যেন সব হচ্ছে সতীর জীবনে। দেখতেই কি কম সুন্দর হয়েছে? পাণ্ডুর জ্যোছনার মতো রঙে এসেছে রক্তোচ্ছ্বাস। সতী যেন ভরে উঠছে দিন দিন। এই দুজনের মধ্যে কোন যোগসূত্র আবিষ্কার করতে পারলে খুব খুশি হবেন প্রতাপ। যোগ যে আছে তাতে সন্দেহ নেই। নিঃসংশয় হয়েছেন মনে মনে প্রতাপ। কেমন করে যেন মনে মনেই

জেনেছেন। এখন শুধু ধরতে পারলে হয়। কেমন করে যে নিঃশেষ করে দেবেন তখন—সেই চিন্তাতেই একমাত্র আনন্দ পান প্রতাপ।

সুযোগ কোথায় অপেক্ষা করছিল তা প্রতাপ-ও জানতেন না।

এবার হোলিতে তিনদিন ধরে উৎসবের আয়োজন হলো। যাত্রা-গান, পালা-কীর্তন চললো সরকারী খরচে। শ্যামরায়ের মন্দিরে যে দোলমচ্ছব হলো তাতে তিনশো টাকা দিলেন নারায়ণী। রায়বাড়ীতে গত কয়মাস ধরে যে গুমোট জমে উঠেছিলো, তার কথা ভুলে গেলেন সবাই। দ্বিতীয় দিন রাত একটার সময় নিমাই সন্ন্যাসের যাত্রা বড় জমে উঠেছে। আসরের সবাই বিমোহিত। আজ প্রতাপ-ও এসে বসেছিলেন। লক্ষ্য করলেন ভবানী আসর থেকে উঠে গেল। মেয়েরা বসেছেন দরদালানে। দেখছেন চিকের ফাঁক থেকে। সেখান থেকেও কেউ উঠে গেল কি? বাজপাখীর চোখ প্রতাপের। তবু অতদূর নিশানা চলে না। তিনিও উঠলেন।

ঘরের পর ঘর, দালানের পর দালান নিঝুম নিশুত। সবাই বাইরে। তিনতলায় সতীর মহলে অনেক দিন আসেন না প্রতাপ। ঘুরে আসতে গিয়ে তাঁর মনে হলো বাগানের দিকে যে গলিপথ তার দরজা যেন খোলা। এদিকে ত' খিড়কির পরিত্যক্ত বাগান। তাঁর বাবার আমল থেকে পতিত হয়ে থাকতে থাকতে চল্লিশবছরে জঙ্গল হয়ে গিয়েছে। সে বাগানও ঘেরা উঁচু পাঁচিলে। তবু এ দরজা রাতে ত' খোলা থাকবার কথা নয়। কি যেন মনে হলো তাঁর। সেদিকে এগিয়ে গিয়ে হাসির শব্দ শুনে সরে দাঁড়ালেন গাছের পাশে। শিরায় রক্ত দপ্‌দপ্‌ করছে, নিঃশ্বাস নিতে ফেটে আসছে বুক, নিজের শরীর যেন নিজের প্রাণের ওপর হাজার মণ পাথরের মতো

চেপে বসেছে। তবু দেখলেন প্রতাপ। দেখলেন খিড়কির দীঘির পথে অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ভবানী সতীর খোঁপায় ফুলের মালা জড়িয়ে দিলো। তারপর তুলে ধরলো তার মুখ।

এর চেয়ে কতো কম অনাচারে, মাত্র জনশ্রুতি শুনে এই প্রতাপই কতো মেয়েকে জ্বলন্ত ঘি জিভে ঢেলে দিতে হুকুম দিয়েছেন। তাঁর প্রথম পিতামহীকে প্রতিমা গড়বার কুমার সুন্দর বলেছিলো ব'লে রাতারাতি বৌকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে আবার বিয়ে করেছিলেন পিতামহ রাজশঙ্কর। আজ তাঁরই স্ত্রী সতী কিনা?···ভাবতে পারলেন না প্রতাপ। পালিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগলেন। তাঁর ঘরের কোণে তাঁর নিজের সড়কী দু'খানা আজ-ও আছে। পাইক-পেয়াদা ডেকে লোক হাসাবেন কি? নিজেই শেষ করে ফেলবেন দুজনকে।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। একেবারে উনিশটা সিঁড়ি গড়িয়ে পড়লেন প্রতাপ। মাথাটা ঠুকল পাথরের চাতালে।

মাথার শিরা ছিঁড়ে গিয়েছে। ভেতরে রক্তমোক্ষণ হচ্ছে। এখন শুধু ঘণ্টা কয়েকের মামলা। বড়জোর একটা দিন টিঁকতে পারেন। বড়বড় কবিরাজরা বিধান দিতে সুরু করলেন।

এ দুর্ঘটনা ভবানীর পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ হলো। এর পরে স্বচ্ছন্দে পালিয়ে যেতে পারবেন। অনেক দূরে বিদেশে—যেখানে কেউ তাঁদের জানে না, চেনে না—সেইখানে যাবেন।

সামান্য জ্ঞান ফিরলো প্রতাপের। কি যেন বলছেন তিনি। ঝুঁকে পড়লো সবাই। ভবানী-ও পাশে বসে। ক্ষীণকণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারণে প্রতাপের শেষ ইচ্ছা উচ্চারিত হলো গ্রামের বহু পাকা-মাথাকে সাক্ষী রেখে। তাঁর সব সম্পত্তি ভবানী পাবে। আর তাঁর সঙ্গে সহমরণে যাবে সতী। সতী বললে পাছে কেউ না বোঝে, তাই বললেন ছোট-বৌ সতী।

শুনে ভবানী আর্তনাদ করে উঠলেন। এতবড়ো অন্যায় হতে পারে না। বে-আইনী হয়ে গিয়েছে এই প্রথা।

একদিকে তিনি আর একদিকে ধর্মোন্মাদ সমাজপতিরা এবং তাঁদের অনুচরবৃন্দ। সমস্ত সংস্কার ভুলে নারায়ণী নিজে এলেন বাইরে। বললেন—এ আমার কর্তব্য। আমি যাব।

সবাই মাথা নাড়লেন। তা হতে পারে না। প্রতাপের শেষ আদেশ সবাই শুনেছে।

ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ভবানী। বারো মাইল দূরে থানায় দারোগা আছেন। রেশমকুঠির সায়েব আছে দু'জন। তাদের আনবেন। বন্ধ করবেন এই হত্যা।

সকলের চোখের আড়ালে সতীকে ঘরে নিয়ে দোর বন্ধ করলেন নারায়ণী। বললেন—তোকে যেদিন ঘরে আনলো, মরবো বলে বিষ এনে রেখেছিলাম। তুই নে ছোট বৌ, খা।

দোর ভেঙ্গে পড়লো মানুষের চাপে। গ্রামে ঢ্যাঁড়া পড়ে গিয়েছে। মেয়ে বৌ-রা এসেছে পায়ের ধূলো নিতে, সিঁদুর পরাতে। তাকে স্পর্শ করবার জন্যেই বা সে কি কাড়াকাড়ি। কেউ আমের শাখা ভেঙ্গে আনছে, কেউ রুগ্ন ছেলের কপাল ঠুকে দিচ্ছে সতীর পায়ে। গহনার ঝাঁপি এনে পরাতে বসলো কেউ। জমিদার বাড়ী মানুষে ভরে গেল। ঘরে দোরে মানুষ। একা নারায়ণীর প্রতিরোধ সেখানে কতটুকু ?

সাহেব দু'জন আর দারোগাকে নিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত অনেক হয়ে গেল। রায়বাড়ীর সামনে যখন ঘোড়া থামালেন ভবানী, তখন এ বাড়ী অন্ধকার ক'রে আলো জ্বলে উঠেছে সেই অনেক দূরে, জলঙ্গীর তীরে। হাজার মানুষের কোলাহল আর চিতার আগুন আকাশের দিকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। ভবানী ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেলেন চিরদিনের মতো। ঘোড়ার পায়ের শব্দ দূর থেকে দূরে চলে গেল।

শশাঙ্ক বললো—তারপর? মহিলা বললেন—তারপর থেকে ঐ ঘাটের নাম বিখ্যাত হলো। আজ-ও এমনি সব রাতে ভবানীর ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যায়। এই পর্যন্ত এসে আবার পায়ের শব্দ দূর থেকে দূরে চলে যায়।

শশাঙ্ক বললো—সত্যি?

—নিশ্চয়। সতীই কি এ বাড়ীতে নেই মনে করো? এই তার ঘর।

মনের হিমশীতল অনুভূতিটা চাপা দিতে চেষ্টা করলো শশাঙ্ক। বললো—তবু সে গল্পই।

—এত আশা আকাংক্ষা সব কি মরে যায়? কখনো মরে না

—সেই ভবানীর আঁকা সতীর ছবিই দেখলাম নিচে?

—হ্যাঁ।

—বড় সুন্দর কিন্তু।

—ও ছবিতে তার কি পরিচয় পাবে? ছবি ত' সম্পূর্ণ নয়?

—সম্পূর্ণ নয়?

উঠে দাঁড়ালেন মহিলা। ভয় এবং ভয়ের অতীত কৌতূহলের মিশ্র অনুভূতিতে তখন হিম হয়ে যাচ্ছে শশাঙ্ক। আলোর সামনে দাঁড়ালেন তিনি। মাথার আঁচল খসে পড়লো। চিক, কান, সিঁথিপাটি, কঙ্কণে হীরে ঝিকমিক করছে—খোঁপা ভেঙ্গে পড়লো চওড়া বেণীতে। আতরের তীব্র মধুর সুবাস। ঝিমঝিম করছে দেহমন তবু চোখ বন্ধ করতে পারলো না শশাঙ্ক। ঢাকাই শাড়ীর আড়ালে অনাবৃত গৌর দেহ দেখা যাচ্ছে। সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি, ঈষৎ গর্বিত সুরে বললেন—

—চিবুকে একটা তিল ছিল যে!

চিবুকের তিলটা জ্বল জ্বল করছে, রাজেন্দ্রাণীর মতো দাঁড়িয়ে

আছেন তিনি। সহসা মধুর হাসলেন। বললেন—ঘোড়া আসছে। আমি শব্দ শুনছি। তুমি শুনতে পাচ্ছ না? আমি যাই।

ঝুলবারান্দায় বেরিয়ে গেলেন তিনি। শশাঙ্কের চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে এলো। তার মধ্যেও সে শুনতে পেল ঘোড়ার পায়ের শব্দ কানে আসছে—খটাখট্! খটাখট্! খটাখট্!

পদ্মিনী

নামেও—রূপেও। ভাগ্য এবং নক্ষত্রের ফলাফলে বিশ্বাস করতে আমার বিংশশতাব্দীর মন চায় না। তবু পদ্মিনীর কথা মনে পড়লে কোন অলক্ষ্য শক্তির নিদারুণ পরিহাসপ্রিয়তার কথাই মনে হয়। সে পরিহাসের দাম দিয়েছে সমর। কিন্তু পদ্মিনীই কি দেয় নি? অনেক ভেবেছি। মনে মনে কেমন যেন সঙ্গতি খুঁজে পাইনি। সঙ্গতি হয়তো সব সময় পাওয়া যায় না। তবু অবাধ্য মন হিসেব খোঁজে।

আজকের সন্ধ্যায় একথা না ভাবলেও পারতাম— কিন্তু আজকের সন্ধ্যায়ই একথা বিশেষভাবে স্মরণ করবার কারণ ঘটেছে। আমার সামনে রূপোলী অক্ষরে ছাপা সাদা রংয়ের সুদৃশ্য একখানা নিমন্ত্রণপত্র প'ড়ে আছে। 'রাণী পদ্মিনী' নামক এতদিনের বহুল প্রচারিত ঐতিহাসিক ছবিখানির মুক্তি উপলক্ষে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন স্বয়ং পরিবেশক। ছবিখানির নায়িকার নামও পদ্মিনী, সেটা এ ছবির উপরি আকর্ষণ। কার্ডখানা এসেছে আমার ওপর-ওলার নামে। তিনি যেতে পারবেন না ব'লে আমি তস্যাৎ তস্য খাতিরে গিয়ে ছবিখানা দেখে এসেছি। সমালোচনা লিখে এখনি পাঠাতে হবে—সে কথাই ভাবছি। খানিকটা দায়িত্ব আছে বৈকি? ছবিটার প্রশংসাই করব। তবে অন্তঃপুরে পদ্মিনীর সহচরীরা প্ল্যাস্টিকের লাট্টু না ঘুরিয়ে অন্য কোন খেলা করতে পারতেন কিনা, পদ্মিনী ও রাণা ভীমসিংহের ফুলের দোলনা চ'ড়ে দ্বৈত সঙ্গীত গাওয়াটা শোভন হ'য়েছে কিনা, এইসব 'কিন্তু' দিয়ে সমালোচনাটা জমাব। মোটের ওপর রূপোলী কার্ডখানা বেশ খানিকটা বৈচিত্র্য

এনেছে আমার মনে। ঠিক এমনি একখানা কার্ড গিয়েছিল সমরের কাছেও। কিন্তু সমর মোটেও খুশী হয়নি। বরঞ্চ এ কার্ড তাকে পাঠানোর জন্যে আমিই যে পরোক্ষে দায়ী সে কথাও শুনিয়ে গেছে আমাকে। এবং এর ফলে যে তার স্ত্রী ট্রামের মাস্থলিখানা বুকের কাছে চেপে ধরে কলহান্তরিতা হয়েছেন, সে কথাও বলে গেছে। যেন দোষটা আমারই।

অথচ, দোষ সত্যিই কি আমার? প্রাক্‌নায়িকা যুগে, পদ্মিনী ছিল সমরের প্রথমা স্ত্রী। ওর বাবা যশোর-বনগাঁ লাইনের ছোট্ট একটা স্টেশনের স্টেশনমাস্টার। মেয়ের রূপ দেখে নাম রেখেছিলেন পদ্মিনী। নাম সার্থক হয়েছিল, বলা চলে বৈকি! শৈশব থেকে বাল্যে, বাল্য থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে, পদ্মিনী দিন দিন ফুটে উঠল অপরূপ সুষমা ও লাবণ্যে। ভাইদের ইতিহাস বইয়ে, তার স্ব-নামীয়া রাজপুত নন্দিনীর জীবন কাহিনী পড়েওছিল একদিন। নিজের জীবনটাকে, এই গতানুগতিক একঘেয়েমির, অলিখিত অথচ অলঙ্ঘ্য গণ্ডীর বাইরে নিয়ে অন্যরকম ক'রে তোলার একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছে তার অপরিণত মনে মাথা চাড়া দিতে থাকল। মাঝে মাঝে সেই ইচ্ছে, সেই তৃষ্ণা দুর্নিবার হয়ে উঠত। তখন আত্মহারা হ'য়ে কমল আঁখি সুদূর-প্রসারী করে শুভ্র ললাটে উড়ান্ পাখীর মতো দুই ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে কল্পনার আকারে উধাও হ'য়ে যেতো তার মন। কি অদ্ভুত সে জীবন! কি অপরিমিত তার সম্ভাবনা! রাণা ভীমসিংহের চিতোর রক্ষার সেই দুর্জয় পণ প্রাচীন ভিনিশীয় আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখে প্রেমে পাগল বিধর্মী বাদশা—সেই অপূর্ব জীবন নাট্যের কোন আস্বাদ যদি আসতো কোন রকমে তার জীবনের সমস্ত একঘেয়েমির পাঁচিল পেরিয়ে! যদি মুক্তি আনতো কোন বিদেশী রাজপুত্র, উদ্ধার করে নিয়ে যেতে তাকে তার এই দৈনন্দিন জীবনের দুঃসহ গতানুগতিকতা থেকে!

মুক্তি আনল সমর। অবশ্য রাণা ভীমসিংহের মতো দুর্মদ রণসজ্জায় সিংহলের রাজপ্রাসাদের তোরণে হানা দিয়ে নয়—জমীদারদের পুরোন ফোর্ডখানা ধার করেই বর আনা হল স্টেশান থেকে। বিয়ের পর সস্তা চেলীর সঙ্গে সমরের চাদরে গাঁটছড়া বেঁধে কলকাতায় গিয়ে নিজের রাজত্বে অধীশ্বরী হোল পদ্মিনী। রাজত্ব তার বৌবাজারের গলির ভাড়া-বাড়ি একখানা। ছোট দু'খানা ঘর, এক ফালি বারান্দা আর একটুখানি উঠোন।

তবু যা হোক নতুন জীবন তো! এই বা মন্দ কি! সমরের সংসারে কেউ নেই। আমরা, অর্থাৎ তার বন্ধুবান্ধবরাই জোরজার ক'রে বিয়ে দিলাম। ঘরে দোরে কোথাও শ্রী ছিল না সমরের। পদ্মিনী ঘসে মেজে তক্‌তকে ক'রে তুলল। পাড় সেলাই ক'রে ঢাকনা দিল নতুন তোরঙ্গটায়। ছুঁচের মুখে বকুল ফুল ফোটালো জোড়াবালিশের ঢাকনীতে, টেবিলের ঢাকনায় বসাল দু'টি রামধনু রঙা পাখী। সমরের অনুরোধে একদিন নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াল তার বন্ধুবান্ধবকে। সেই সন্ধ্যাবেলাতেই আমি পদ্মিনীকে প্রথম দেখি। ওর বিয়েতে আমি যাইনি, বৌ-ভাতেও নয়। সুন্দরী বৌ এনে সমর কেমন যেন দিশাহারা হ'য়ে গিয়েছিল। তাছাড়া একলা মানুষ তো! কতজনকে নেমন্তন্ন করেছিল, এই নিমন্ত্রণের ভেতর দিয়ে সেই সব ত্রুটি মিটিয়ে নিতে চাইল সমর। আমরাও খুশি হ'য়েছিলাম বৈ কি! পদ্মিনীর সেদিনকার চেহারা কখনো কি ভুলব! সমরের অন্য বন্ধুরাই কি ভুলেছে? সে ছবি ভোলবার নয়। মাথায় কাপড় থাকে না, বার বার বিস্রস্ত আঁচল এসে পড়ে হাতের ওপর। শ্রমে আর ঘামে একটু রাঙা মুখ, আর অক্ষমতার জন্য অপরাধী, একটু লাজুক হাসি। সেদিন মুক্তকণ্ঠে সবাই সমরকে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। নিখিল তো বেহায়ার মতো গানই জুড়ে দিয়েছিল, "বাজোরে বাঁশরী বাজো!" সস্মিত কৌতুকে বার বার হেসেছিল পদ্মিনী অপূর্ব বিম্বোষ্ঠ কাঁপিয়ে, ভাষা না পেয়ে!

কিন্তু সে তো এক সন্ধ্যার ব্যাপার! তারপর থেকে রোজকার দিনগুলো যেন কাটতে চাইত না পদ্মিনীর। সমর প্রতিদিন অফিসে চলে যায় সকাল ন-টায়—ফিরতে ফিরতে তার ছ'-টা বাজে। ছোট্ট সংসারের কাজ সেরে সময় যেন অচল হ'য়ে ওঠে পদ্মিনীর কাছে। অবসর সময়ে নানা ছাঁদে চুল বাঁধে, ছোট্ট হাত আশাখানায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুখ দেখে। এইসব নিরালা মুহূর্তের সুযোগ পেয়ে আবার তার দুরাশারা ভীড় করে এল। যে জীবন সে চেয়েছিল, এই কি সেই জীবন? কোথায় বৈচিত্র্য এর মধ্যে, কোথায়ই বা নতুন নতুন আনন্দের উপাদান? তার একমাত্র সঙ্গী হোল সমর। সে নেহাৎই সমরবিমুখ বাঙালী কেরাণী। সমরের দুই বাহুকে আশ্রয় ক'রে বড় জোর সিনেমায় যাওয়া যায়। কিন্তু তার ভরসায় বৃহত্তর জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়া চলে না। সিনেমা দেখে দেখে, দুরাশা আরো উত্তাল হ'য়ে ঘা দেয় পদ্মিনীর ঘুমের মধ্যে। কল্পনার রাজ্যে সে স্বাধীন। অনুশাসন বা বল্‌গা নেই কোথাও। তাই সেখানে পদ্মিনী স্বপ্ন দেখে রামধনুরঙা সাতমহলের। সেখানে একক অধীশ্বরী সেই-ই! সেখানে ঐশ্বর্য, রঙ, গান আর প্রেমের ছড়াছড়ি। এবং সব কিছুরই লক্ষ্যস্থল সে। সবকিছুই গিয়ে পৌঁছয়, একান্ত ক'রে তারই স্বভাব-অলক্তাভ পায়ের তলায়।

তার এই স্বপ্নের হদিশ সমর পেয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু সেই আনল নিমন্ত্রণ ক'রে এ নাট্যপর্বের তৃতীয় ব্যক্তি দেবব্রতকে। সমরের কলেজ জীবনের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। দেবব্রত বড়লোকের ছেলে। সুপুরুষ এবং বে-হিসেবী। কলেজে বি-এ পড়তে পড়তে হঠাৎ চলে গিয়েছিল বর্মায়—জড়োয়া পাথরের ব্যবসা করবে বলে। তারপরে জীবনকে বহুতরভাবে আস্বাদ করতে করতে যখন ক্লান্তি এসেছে একটু একটু তখন সমরের সঙ্গে দেখা। সমর ছাড়ল না। নিয়ে এল তাকে বাড়িতে। চোখ টিপে বলল—

মনে মনে ধাক্কা খাবার জন্যে একটু তৈরী থাকিস। প্রথম দর্শনের চমক সামলানো কঠিন কিন্তু।

দেবব্রত হেসে বল্‌ল—

—তুই তো বল্‌বিই। এখন তো চোখে তোর রঙীন চশমা কিনা! তবে সবটাই প্রমাণ সাপেক্ষ।

পদ্মিনী এত কথা কিছুই জানত না। সমরের ব্যস্ত সমস্ত ডাকে, ময়দা মাখতে মাখতে উঠে এসেছে তাড়াতাড়ি। দরজা দিয়ে ঢুকতেই তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখে ঘোমটা টানল বটে পদ্মিনী, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি সেই চকিত দেখেই বিস্ময়ে ক্ষণ-মৌন হয়ে গেছে। সমর তো হেসেই আকুল! আলাপ করিয়ে দিল হৈ হৈ ক'রে। দেবব্রত বলল—

—একেবারে ইতিহাসের পাতা থেকে উঠিয়ে এনেছিস যে!

—ঐ পর্যন্তই! —বলল সমর—

—তারপর আর যথাযোগ্য কি করতে পারছি বল? এর পরে যথানিয়মে চা এলো। এলো খাবার। বহুক্ষণ গল্পগুজব ক'রে দেবব্রত বলল—

—এর পরে কিন্তু বার বার হানা দেব সমর—তাড়িয়ে দিবি না তো? সমর হাসল। বলল—

—তাহ'লে তো বেঁচে যাই আমি। আমার মোটে সময়ই হয় না—অথচ ও থাকে একেবারে একলা। সত্যি আসিস ভাই—তা'হলে আমার দিক থেকেও খানিকটা দায়িত্ব কাটবে।

দেবব্রত চলে গেলে পদ্মিনী মিষ্টি করে অভিমান করল। ছোটবেলার মতো একটু ঠোঁট ফুলিয়ে বলল—

—বাইরের লোকের কাছেও অমনি বলবে! কেন আমি বুঝি দায় তোমার? শুধু একটা বোঝা?

সমর তার মুখের দিকে তাকিয়ে অপলক হ'য়ে গেল। তারপর গভীর মমতায় বলল—

—বোঝাই তো! কিন্তু ভারী মধুর—ভারী লোভনীয়—

—যাও!

ব'লে ছোট্ট একটি কিল দেখিয়ে চলে গেল পদ্মিনী! অপস্রিয়মান ডুরে শাড়ীর আঁচলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হয়তো প্রথম মনে হোল সমরের, পদ্মিনীকে মানায় না তার এই দরিদ্রের সংসারে। এখানে যেন ওকে মানায় না—বোধ হয় ওর ঠাঁই হওয়া উচিত অন্য কোন বৈভবময় অলকাপুরীর মণিকোঠায়। ভেবে ভেবে ছোট্ট অথচ গভীর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস তার বুকখানা মথিত ক'রে উঠে এলো। হাতের সিগারেটটা টানতে ভুলে গেল সে। এম্‌নিই জ্বলে জ্বলে সে-টা নিঃশেষ হয়ে গেল।

তারপরের দিন এলো দেবব্রত হঠাৎ দুপুরবেলা—অনেকগুলি ব্রাউন কাগজের প্যাকেট নিয়ে! বলল—

—সব কাজ ফেলে রেখে আসুন বৌদি! সেদিন তো শুধু হাতে মুখ দেখে গেছি আজ এসেছি প্রায়শ্চিত্ত করতে!

পদ্মিনী বলল—

—এসব কি? ও-মা, কি এনেছেন এতগুলো?

—খুলুনই না! দেখুনই একবার খুলে—

ভীরু অথচ উত্তেজিত ঘাম ঘাম হাতে প্যাকেটগুলো খুলে ফেলল পদ্মিনী। দামী একখানা পল্লু-শাড়ী, কাঁচের কাজ করা ব্যাগ, ছোট্ট গোলাপী আর সোনালীতে খচিত নাম-না-জানা পাথরের কুণ্ডল এক জোড়া, প্রসাধনের টুকিটাকি কতকগুলি—! ভীত, সন্ত্রস্ত গলায় পদ্মিনী বলল—

—এ কি করেছেন? এতো সব কি হবে?

—পরবেন। ব্যবহার করবেন।

গভীর চোখ তুলে বলল দেবব্রত—

—জিনিসগুলি আর এমন কি! ওগুলি আপনি ব্যবহার করলে তবে যদি কিছু মূল্য বাড়ে!

এতো কথার জবাব খুঁজে না পেয়ে দিশাহারা হ'য়ে একটু হাসল পদ্মিনী। বলল—

—এখন তো দুপুর! একটু সরবৎ আনি?

—না-না! তার চেয়ে ব'সে আপনি গল্প করুন।…

স্বামীর একজন বন্ধুর সঙ্গে ব'সে এমন ক'রে গল্প করাটা উচিত কিনা দ্বিধা করছিল পদ্মিনী। তার সব সঙ্কোচ আস্তে আস্তে জয় করল দেবব্রত। ঘরোয়া ছোটো খাটো সব আলাপের মধ্য দিয়ে দেখা গেল পদ্মিনী কখন সহজ হ'য়ে উঠেছে। সে-ও কথা বলছে অনেক। কলকাতা তার কি রকম খারাপ লেগেছিল প্রথম প্রথম, বাবা, মা, ভাইবোনদের ছেড়ে এসে। ছোট ভাইটিকে এখন অবিশ্যি মিনিই খাইয়ে দেবে, কিন্তু স্নান করানো নিয়েই মুশকিল। একবার যাবার ইচ্ছা আছে—তা সমর কি রকম অগোছালো—হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয়ই সব এলোমেলো ক'রে রাখবে—খাওয়াই হবে না তার মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন। স্টোভে রেঁধে খেতে হ'লে সমর যা করবে—ব'লে পদ্মিনী হাসিভরা চোখে তাকাল দেবব্রতের দিকে—তারপর দু-জনেই হেসে উঠল।

দেবব্রতর ব্যবহারে সমর খুশিই হ'ল। সমর মানুষটা বরাবরই সাদাসিধে. তা-ছাড়া দুনিয়ার ওপর চিরদিনই কেমন একটা বিশ্বাস আছে। এই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ধোপা, মেসের চাকর, বন্ধুবান্ধব, গ্রামসুবাদের রাঙা পিসেমশায়, কেউই তাকে ঠকাতে কসুর করেনি। কিন্তু তাতে তার, দুনিয়ার তথা দুনিয়ার সব মানুষের অন্তর্নিহিত নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণকামী সত্তার ওপর বিশ্বাস এতটুকু কমেনি। আজও সে চোখ বুঁজে সবাইকে বিশ্বাস ক'রে চলে। কাজেই পদ্মিনী বা দেবব্রত, কারুর ব্যবহারেই এতটুকু সন্দেহ এলো না তার।

সন্দেহ মনে ছিল না পদ্মিনীর-ও। মেয়ে, তা সে যে কোন মেয়েই হোক না কেন, পুরুষের অনুরাগ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন।

কাজেই পদ্মিনী, চোখ খোলা রেখেই দেবব্রতর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতম হয়ে উঠল। এর পেছনে তার দুরাশার চরিতার্থতার কোন সম্ভাবনা ছিল কিনা কে বলবে! দেবব্রত বৃহত্তর রোমাঞ্চকর এক জীবনের চাবিকাঠির সন্ধান জানে, এমনি ভাবেই হয়তো দেখছিল পদ্মিনী তাকে। কে বলবে! সমর থাকল সাথে সাথে ছায়ার মতো—ভালোমানুষ আপন-ভোলার মতো নিজের খেয়ালে চোখ বুঁজে। এদিকে দেবব্রতর গাড়ী যখন তখন দাঁড়াতে লাগল সমরের দরজায়। আজ পিক্‌নিক্, কাল গঙ্গার ধার, লেকে বেড়ানো পুরোনো হ'য়ে গেছে যদি, তো লাইট হাউসে যাওয়া যাক্ ন-টার শো-এ, এমনি সব বে-হিসেবী আগল-ভাঙা আনন্দের পুনরাবৃত্তি হ'তে লাগল ঘন ঘন।

এমনি ক'রে এলো দোলের দিন। সমর ছিল না বাড়িতে—ব'লে গিয়েছিল রাত ক'রে ফিরবে। ঘরের টুকিটাকি কাজ সেরে প্রসাধন করল পদ্মিনী সযত্নে। লালশাড়ীর সঙ্গে হলদে জামা—চোখে কাজলের আভাস আর লাল কাঁচের মালা গলায়। সেজে গুজে হঠাৎ মনই খারাপ হ'য়ে গেল তার। মনে হ'ল আজকের দিনটা এমন নিঃসঙ্গভাবে কাটাতে হবে কেন! হাতের কাজ ফেলে, পথচারী জনতার আনন্দ কোলাহলে একটু উন্মনা হ'য়ে চেয়ে থাকল পদ্মিনী। এমনি সময়ে ঢুকল দেবব্রত। হাতে তার রুমালে বাঁধা আবীর, আর এক বোঝা সদ্য ফোটা পলাশ ফুল। ফুলগুলি পদ্মিনীর হাতে দিয়ে বলল—

—জানেন, এই ফুলগুলি আনব ব'লে সকালে উঠে ডায়মণ্ড-হারবার রোড ধ'রে আমি কতদূর গেছি?

—কেন?

দুষ্টুমিভরা চোখে বলল পদ্মিনী।

—কেন? বা-রে! পলাশ বুঝি কলকাতায় পাওয়া যায়? যা-ও আছে, তা-ও তো করপোরেশানের মালীর নজরবন্দী।

কিন্তু সমরটা গেল কোথায়? আজ তো হোলির দিন। আপনাকে এতটুকু রঙ মাখায়নি? একেবারেই বে-রসিক! আসলে আপনি যে এ যুগের নন, আপনি যে রাজপুতানার মধ্যযুগের লোক তা ও মনেই রাখে না। জানেন না তো, রাজপুতরা কি রকম হোলি খেলত!

—কি রকম?

ব'লে পদ্মিনী এমন মনোহারিণী ভঙ্গিমায় ঘাড় বাঁকিয়ে চাইল, যে দেবব্রত আবীর দিতে ভুলে গিয়ে পদ্মিনীকে বেষ্টন ক'রে আনল বুকের কাছে। অন্য হাত দিয়ে চিবুক তুলে ধরল ওর।

কয়েকটি নিশ্বাসঘন মুহূর্ত! তারপরেই বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো নিজেকে ছাড়িয়ে নিল পদ্মিনী। দরজায় দাঁড়িয়ে সমর। তার-ও হাতে এক ঠোঙা আবীর। মুখ তার ছাই-এর মতো সাদা। দেবব্রত কি বলতে গেল। দরজার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বলল পদ্মিনী—

—আপনি যান!

সেদিন সারাদিন গেল। দেবব্রত হোটেলে তার কামরায়। সন্ধ্যাবেলা, সিগারেটগুলি একবার ক'রে টেনে ফেলে দিচ্ছে আর পায়চারী ক'রে বেড়াচ্ছে অস্থির পায়ে—এমনি সময়ে এলো পদ্মিনী। ঝড়ের মুখে পাখী যখন উড়ে চলে, তখন সে যতোখানি নিরাশ্রয়, ততখানি অসহায়। ঝড়কে বুঝতে পারে না ব'লেই সেই প্রচণ্ড অদৃষ্টের কাছে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলে সে! পদ্মিনী-ও তেমনি ক'রেই এলো। যেমন অসহায় তার চেহারা তেমনই বিস্রস্ত সে দেহে এবং মনে। এতোদিন ভাগ্যকে লাগাম টেনে ধ'রে খেলা করবার ইচ্ছা ছিল তার, আজ ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অশ্রু-বর্ষণ ছাড়া আর কোন পথই খুঁজে পেল না সে! সাশ্রুনয়নে জানালো সমর তাকে বের ক'রে দিয়েছে। গালাগালি করেছে, এমন কি মেরেছে-ও! এই কথাগুলি কেঁদে কেঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল পদ্মিনী। সব কথা ব'লে, জলে ভেজা চোখ তুলে দেবব্রতর দিকে চেয়ে বলল পদ্মিনী—

—এখন আমি কি করব ?

দেবব্রত বললে—

—আমায় বিশ্বাস করতে পারবে তো ?

—তা ছাড়া আর কি উপায় আছে ?

—ভেবে দেখেছো, সমরের ওখানে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে কি না ?

—সেখানে ?

গলাটা এমনই আর্তি-মেশানো পদ্মিনীর যে দেবব্রত আর কোন কথাই খুঁজে পেল না। বাহুবন্ধনে ওকে টেনে নিতে পারল শুধু।

তারপরে দু-মাস, কলকাতা থেকে দিল্লী, সেখান থেকে বোম্বে, মাদ্রাজ ঘুরে, আবার যখন কলকাতায় ফিরল তারা, তখন দেবব্রতর চোখে পদ্মিনীর রং অনেকটা ফিকে হ'য়ে এসেছে। শুধুই রূপ দিয়ে সে কি করবে! চলন, বলন কোনদিকেই পদ্মিনী তার স্তরের যোগ্য নয়। তাছাড়া নীড় বাঁধতে দেবব্রত চায়নি। পদ্মিনীর শুধু অপরূপ মুখশ্রী-ই আছে। তার নিচে যে মনটা আছে, সেটা একান্তই জোলো, পান্‌সে একটি বাঙালী মেয়ের। একে নিয়ে দুরন্ত আশায় সওয়ার হ'য়ে ঝড়ের মুখে গা ভাসিয়ে দেওয়া চলে না। আর দেবব্রতর ব্যবসা বাণিজ্যও তো আছে? একটা নেশা নিয়ে জীবনটা বইয়ে দেবে, তেমন কাঁচা ছেলে সে কোনদিনই নয়। এমনি তরো সাত পাঁচ ভেবে. তারা ফিরল কলকাতায়। পদ্মিনীকে ঠিক সোজাসুজি পথে বসাতে কোথায় যেন বাঁধছিল দেবব্রতর। নিজের এ বিবেকবোধে নিজেই সে আশ্চর্য হ'য়ে যাচ্ছিল। কেননা, এ অনুভূতির সঙ্গে সে নেহাৎই অপরিচিত। সে যে মানসিক স্তরের মানুষ, সেখানে মেয়েরা অত্যন্ত সুলভ। দরকার মতো তাদের পাওয়া যায়। আর দরকার ফুরোলেই তাদের ফেলে দেওয়া চলে। কিন্তু পদ্মিনী এতো অসহায়, এতোই

নির্ভরশীল, সামান্যতম ভর্ৎসনাতে এমন ক'রে সে তাকায়। বেদনাবিদ্ধ সে হরিণ-চোখ দেখলে, সবকিছু সংকল্প আল্গা হ'য়ে আসে দেবব্রতর! তবু সময় আর নষ্ট করা চলে না। তিন দিনের জন্যে ডায়মণ্ডহারবার যাচ্ছি বলে, পদ্মিনীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, হোটেলের ম্যানেজারের কাছে পদ্মিনীর জন্য এক মাসের খরচ রেখে বেরিয়ে গেল সে। তিন দিন গিয়ে সাত দিন যখন পেরিয়ে গেল, পদ্মিনী পড়ল দুর্ভাবনায়। কলকাতায় সে কারুকে চেনে না। এক সমর ছাড়া। সেখানে যাবে কি যাবে না ভেবে ভেবে, অগত্যা সন্ধ্যার পর সেখানেই গেল পদ্মিনী।

সমর তাকে ফিরিয়ে নিলে উপসংহার জমতো ভাল, কিন্তু সে নাটকীয় পরিণতি বাস্তব জীবনে ঘটে না। বাস্তব জীবনে নাটকের স্থান নেহাৎই কম। সমর অবিশ্যি রূঢ় ব্যবহার করল না। সোজাসুজি বুঝিয়ে বলল, সে খেটে খায়, তার যেমনই হোক একটা সমাজ আছে, সেখানে বহুজনের সুবিধে অসুবিধে মেনে তাকে চলতে হয়। যদি সমর অগাধ অর্থের মালিক হতো, তা হলেও হয়তো-বা তারা দুজনে দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারতো। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তা সম্ভব হবার কোনও উপায়ই নেই। তাছাড়া, সমর পদ্মিনীকে সত্যিই ভালোবেসেছিলো, বিশ্বাস করেছিলো, সে বুনিয়াদটাও গেছে ভেঙ্গে। সে বলল—

—সব ভুলে গিয়ে নতুন ক'রে শুরু করতে পারলে ভালো লাগত আমারও। কিন্তু জীবন তা করতে দেয় কই? যতোই চাই না কেন, আমার মন কি জোড়া লাগবে? তুমিই বলো!

তারপর সমর সস্নেহভাবে বলল, পদ্মিনী যেন দেবব্রতর কাছ থেকেই নেয় তার পথের নির্দেশ। এমন কি, যাবার সময় পদ্মিনীর বার বার প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও, তার হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিল, নিজের আলোয়ানখানা জড়িয়ে দিল তার গায়ে।

হোটেলে ফিরে পদ্মিনী যখন দরজা খোলা রেখেই বিছানার ওপর ভেঙে প'ড়ে সবে কাঁদতে সুরু করেছে— দরজায় টোকা মেরে ঢুকলো একটি অপরিচিত ভদ্রলোক— সঙ্গে তাঁর হোটেলের ম্যানেজার।

ম্যানেজার বললেন—

—এই ভদ্রলোক হচ্ছেন বোম্বাইয়ের চেট্টিয়ার ফিল্ম সার্ভিস-এর এজেন্ট। ইনি আপনার সঙ্গে কতকগু'লো কথা বলতে চান। আপনি এর ভাষা তো বুঝবেন না। কাজেই আমিই বুঝিয়ে দিচ্ছি—আপনার আপত্তি নেইতো ?

পদ্মিনী বোকার মত ঘাড় নাড়ল। তারপর একঘণ্টা ধ'রে বহু তর্কবিতর্কের পরে যা জানা গেল, তা হচ্ছে, বোম্বাইয়ের উপরোক্ত সুবিখ্যাত চিত্রপ্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি তাদের ঐতিহাসিক ছবি 'রাণী পদ্মিনী'র জন্য একজন নায়িকা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ, কলম্বো ইত্যাদি বড় বড় শহরে ইনি ঘুরেছেন, কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছেন, কিন্তু ঠিক মনোমত কাউকে পাননি।

এই হোটেলে কফি খেতে এসে পদ্মিনীকে দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখে অত্যন্ত চোখে লেগেছে তাঁর। ম্যানেজারের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও একবারটি পদ্মিনীর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন তিনি। পদ্মিনীর স্বামী যদি রাজী হন, তবে এখনি তিনি কথাবার্তা পাকা করে ফেলতে চান—অবিশ্যি জিনিসটাকে একটা অতি শুদ্ধ এবং সৎ শিল্প প্রচেষ্টা হিসেবে যদি তাঁরা দেখতে চান তবেই এ সম্বন্ধে কথাবার্তা হ'তে পারে। নতুন এবং শিক্ষানবীশ বলে প্রথম তিন মাস পদ্মিনী হাজার টাকা হিসেবে মাইনে পাবে। পরে যোগ্যতা অনুসারে বাড়বে।

অকূলপাথারে ভাসমান অবস্থায় তৃণখণ্ড নয়, এমন একখানি শক্ত নৌকা ধ'রতে পেরে পদ্মিনী বর্তে গেল। সে বলল—

—উনি আমার স্বামী নন্। কেউ নন্। আমার কোন আপত্তি নেই।

সেই রাতেই পদ্মিনী এজেন্টটির সঙ্গে চলে গেল বোম্বাই। দেবব্রত ফিরে এসে সব জানলে ম্যানেজারের কাছ থেকে। একলা ঘরে ব'সে পদ্মিনীর নিজস্ব টুকিটাকি জিনিসের ছড়াছড়ি অবস্থা দেখে কেমন একটা বিষণ্ণতা দেবব্রতকে ক্ষণিক ব্যথিত ক'রে তুলল। মনে হোল তার, এতটা রূঢ়তা না করলেই পারতো সে। কে জানে, যা হোল তাতে পদ্মিনীর ভালো হলো কিনা! হুইস্কী আনতে হুকুম দিল দেবব্রত—সোডা আর একটা গ্লাসও পাঠিয়ে দিতে বলল ম্যানেজারকে।

পদ্মিনী ততদিনে নতুন জীবনের সওয়ার। মালিক ও প্রযোজক শ্রীযুত চেট্টিয়ার প্রথম থেকেই পদ্মিনীকে অত্যন্ত সুনজরে দেখলেন। এ ছবি শেষ হ'তে না হ'তে পদ্মিনী আরো তিনখানা নতুন ছবির কণ্ট্রাক্ট করল তাঁর সঙ্গে। সেই সঙ্গে উপরি সর্তে, তাঁর হৃদয়েরও পনেরো আনা অংশের মালিক হ'য়ে বসল।

এসব কথা আমার পদ্মিনীর মুখ থেকেই শোনা। কলকাতায় ছবি মুক্তি পাবার সময় প্রযোজক এবং নায়িকা উপস্থিত থাকবেন জেনে, অন্যান্য চিত্র সম্বন্ধীয় পত্রিকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমিও ভিড় করেছিলাম পদ্মিনী দেবীর হোটেলে। কার্ড পাঠিয়ে দিয়ে আমিও অপেক্ষা করছিলাম আর সবাইয়ের সঙ্গে। সবাইকে অবাক ক'রে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন পদ্মিনী দেবী। দুরু দুরু বক্ষে দরজায় টোকা দিলাম। দরজা খুলে যাকে দেখলাম, সে পদ্মিনীই। কিন্তু বেশে ভূষায়, কথায় বার্তায় এ যেন অন্য কেউ। এমন শাণিত চাহনী, এমন গর্বিত আত্মপ্রচার, এমন বাঁকা কথা আর ছুরির ফলার মতো হাসির এতটুকু আভাসও ছিল না দু-বছর আগেকার আমার পরিচিত সেই পদ্মিনীর মধ্যে। আমাকে অবিশ্যি আপ্যায়ন করল সে, কফি আর খাবার আনিয়ে দিলো।

সিগারেট আমাকে দিয়ে, নিজেও ধরাল। তারপর ছাইদানীতে সিগারেটটা রেখে স্বপ্নালু চোখে বলল—

—সিগারেট আমি বেশী খাই না। কিন্তু জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে যেতে দেখতে বড় ভালো লাগে।

বুঝলাম ভালোলাগা-না-লাগাতেও পদ্মিনী মৌলিকতা অর্জন করেছে। তারপর ও শোনাল ওর জীবনের সমস্ত কথা। সমরের খবর জানতে চাইল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। সমর আবার বিয়ে করেছে, একটি ছেলে হয়েছে তার, এসব কথা বললাম। সমরের বর্তমান ঠিকানাটা জানতে চাইল। বলল, একখানা কার্ড পাঠিয়ে দেবে। আমি উঠলাম। যাবার সময়ে বলল—

—আবার দেখা করতে পারলে সুখী হ'তাম। কিন্তু আজই বোম্বে ফিরব। মিঃ চেট্টিয়ারের স্বাস্থ্য আবার বোম্বে ছাড়া কোথাও টেঁকে না— এমন কষ্ট পান। রাতের প্লেনেই ফিরব।

সমরের দ্বিতীয়া স্ত্রী সুশ্রী নন এবং একটু কলহপ্রিয়াও বটে। কিন্তু তবুও সমর সুখীই হয়েছে বলে মনে হয়। আজ সন্ধ্যাবেলা অবিশ্যি পদ্মিনীর পাঠানো কার্ডখানা নিয়ে একটু ঝগড়া হয়ে গেছে ওদের মধ্যে। আমারও ভালো লাগেনি ব্যাপারটা। ভাবছি একথাটা পদ্মিনীকে জানাবো। জানাবো, সে-তো তার স্বপ্ন এবং মানসের চরিতার্থতা পেয়েছে রূপোলী পর্দায়। হাজারটা হাতের হাততালিও সে পাবে। আশা করা যায়, এখন থেকে তার জীবন জয়দীপ্তই হবে। কিন্তু সে জীবনের ছায়া ফেলে সমরের জীবনের সহজ গতিতে কোন বিঘ্ন ঘটানো কি তার পক্ষে উচিত হ'ল? সমরের তো কোন বৃহত্তর জগতের পটমঞ্চ রইল না। তার তো শুধু এতটুকু ঘরদোর আর বৌ-ছেলের ঘরোয়া জগৎ—যা নাকি একদিন পদ্মিনী ত্যাগ করে গেছে। সেখানে কোন তালভঙ্গ করাটা পদ্মিনীর পক্ষে উচিত হবে কিনা, সেই কথাটাই বিশদ

করে লিখবো ওকে। বিশেষ করে সমর যখন ওর এতোখানি শুভানুধ্যায়ীর কাজ করেছে অজান্তে!

যে সন্ধ্যায় পদ্মিনী ফিরে এসেছিলো সমরের কাছে, সে সন্ধ্যায় তাকে গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দিয়েছিল সমর। তা যদি না দিত, যদি সব দোষ ক্ষমা করে ফিরিয়েই নিত তাকে, তাহ'লে কি আজকের এই গৌরবমাল্য জুটত পদ্মিনীর কপালে?

শুধু পটে লিখা

নাতিদীর্ঘ দেহ, ফর্সা রঙ, ঈষৎ পীতাভ মুখে টানা টানা ভুরু, ঘনকালো চুল টান টান করে বাঁধা। শাড়ীর কুঁচিতে এতটুকু ভাঁজ নেই, প্রসাধন কখনও দৃশ্যতঃ ম্লান হয় না, সেই বড় বড় চোখের দৃষ্টিও অচঞ্চল। -

মেয়ে নয় তো ছবি। যেন পটে লেখা।

যে নয়নের দিকে তাকালে শুধু দেখতে ইচ্ছে করে, হৃদয়কে অশান্ত করে, চোখের তৃষ্ণা মিটায়, সেই নয়নের হৃদয় আছে কি না কে জানে! অনেক দিনের পরিচয়। সেই ছবির মতো মানুষটিকে মনে মনে ভালোবেসেছে বিনু। প্রথমে তার স্থির সৌন্দর্যের নিরুত্তাপ আকর্ষণে টান লেগেছিল মনে। তারপর স্বল্পভাষী, আত্মমগ্ন, গর্বিত মেয়েটিকে ভালোবেসেছে বিনু। তবু বলতে সাহস হয়নি।

ছোটবেলা থেকেই ছন্নছাড়া বিনু। বাপের অর্থ ছিল। মায়ের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। লাজুক, ভাবুক আর আত্মসচেতন ছেলেটাকে দেখলেই বাপের মনে হ'ত এ বুঝি মানুষের মতো মানুষ হ'য়ে উঠবে না। বিনুর বাবা চিরদিন তুনিয়ার চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছেন। কর্মী লোক। স্বভাবে এতটুকু শিথিলতা নেই। ফলাফলের জন্য এতটুকু চিন্তা না করে কর্ম করে যাবার নীতিকে তিনি জীবনে কাজে পরিণত করেছেন। তাঁর ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনায় ভালো হবে, চালচলনে হবে পাকা, এমনি করেই তৈরী করেছেন তাদের, এবং সফল হয়েছেন। তাঁর তুই ছেলে ইঞ্জিনীয়ার। একজন কৃষিবিদ্যায় বিদেশের ডিগ্রী রাখেন।

মেয়েরা এক হাজারী দেড় হাজারী মনসবদারদের গৃহ অলংকৃত করেছেন। দাঁড়ায়নি শুধু বিনু! ম্যাট্রিকে ভালো ফল করেও পড়েনি সে। পাড়ায় পাড়ায় মিশেছে নানা মানুষের সঙ্গে তবু অন্তরঙ্গ হয়নি কোথাও। গান শুনেছে রাত জেগে। প্রয়োজনে সেবা করেছে, শব দাহ করেছে। নদীর ধারে ব'সে আপন মনে বাঁশি বাজিয়েছে। ছেলেটা মানুষ হ'লনা জেনে, তার পিতার ও ভাইদের তার প্রতি মনোভাবটা ছিল অসহিষ্ণু। মা রাত জেগে বসে থেকেছেন খাবার নিয়ে। শীতকালের মাথার দিকের জানালাটি বন্ধ করে গায়ে টেনে দিয়েছেন কম্বল।

বাবা মারা গেলেন। বাবার অনুসরণ করলেন মা। বন্ধনমুক্ত হয়ে সহসা বিনু আবিষ্কার করল তার থাকবার জায়গা নেই। কাজ খুঁজে না নিলে আর চলবে না।

কাজ নিল মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ-এর। চলে গেল ভারতের পশ্চিম সীমান্তে আমেদাবাদ-এ। একদিন মোগল আক্রমণ করেছিল ভারত। মোগল ও ভারতীয় শিল্পের সমন্বয়ের কিছু কিছু চিহ্ন আজও আমেদাবাদে মেলে। আশ্চর্য সুন্দর মর্মর জালিকা শোভিত মসজিদের শীতল ছায়াচ্ছন্ন প্রাচীরে। প্রায়ান্ধকার ঠাণ্ডা রাস্তার ওপর কোনো পুরোণ বাসিন্দার কাঠ আর গালার কাজ করা বাড়ীতে, নয়তো বড়ো বড়ো দরজায়। অন্যথায় আমেদাবাদ ঝক্‌ঝকে নতুন উঠ্‌তি শহর। সারা ভারতের কাপড় জোগায় আমেদাবাদের মিলগুলো। কাপড়ের টাকা চালু টাকা। তার লেনদেন আছে, সঞ্চার আছে, প্রসার আছে। মিল বাড়ছে, বাড়ী উঠছে, স্কুল গড়ছে। এ টাকা ব্যবহারে সার্থক।

বিনুর থাকার জায়গা হলো, কোন কাপড়ের মিলের বাঙালী কর্মচারীর বাড়ীতে। অমলবাবুর স্ত্রী তৃপ্তি বিনুর চেয়ে বয়সে কয় বছরের-বা বড় হবেন। মধুর স্বভাব, এলোমেলো অগোছালো সংসার, একটি দুরন্ত শিশু নিয়ে কাজে কর্মে হাজারটা অপটুতা

আর সেই জন্যে উছলে পড়ে হাসি। তৃপ্তিকে দেখেই ভালোবাসল বিনু। স্নেহ মমতার চির-কাঙাল মন তাব ধরা দিল তৃপ্তির আন্তরিক সেবা যত্নে, মিত্রতায়।

কোনদিন যে এই পরিবারের থেকে আলাদা মানুষ ছিল বিনু, সে কথা মনে করা অসম্ভব কোন বাইরের মানুষের পক্ষে। সকালে একই সঙ্গে খেয়ে বেরিয়ে যায় বিনু, অমলবাবুর সঙ্গে। সন্ধ্যায় ফিরে একসাথে ক্যারম অথবা তাস খেলে। কখনো রেডিও শোনে, কখনো তৃপ্তি ছোট ছোট জামা বুনতে বুনতে বিনুর সঙ্গে মৃদু গলায় তার বাপের বাড়ীর গল্প করে। একটি মধুর সম্ভাবনা পুনর্বার আসন্ন তার জীবনে।

এই বাড়ীতেই নয়নের সঙ্গে বিনুর প্রথম পরিচয়। বরোদার প্রবাসী অধ্যাপক তৃপ্তির মামা। তাঁর মেয়ে নয়ন। প্রথম যখন সে এল, বিনু তাকে আনতে গিয়েছিল। ট্রেণ থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে নীল শাড়ী পরে যে মেয়েটি উৎসুক চোখে তাকাচ্ছিল এদিক ওদিক সেই নয়ন।

—অমলবাবুর বাড়ী থেকে আসছি আমি।

—বুঝেছি, আপনি সুবিনয় বাবু? তখন বিব্রত বিনুর মনে পড়েছিল হ্যাঁ, তার একটা ভালো নাম আছে। যে নামে কেউ তাকে ডাকে না। প্ল্যাটফর্ম ভরা মানুষের চলাফেরা কর্মব্যস্ততা। তার পটভূমিকায় নিপুণ প্রসাধনে চিত্রাঙ্কিতার মত সুন্দর এই মেয়েটিকে দেখেই কি রকম যেন লেগেছিল বিনুর। আসলে নিজের ভালো লাগা আর না লাগাকে কোনদিন মর্যাদা-ও দেয়নি সে। সে সেই বিনু, যার কোন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য পরিবারে স্বীকৃত নয়। যার সমস্ত সত্তাই বারোয়ারী, আলাদা মন যার থাকতে নেই। এই প্রথম ভালো লাগার ক্ষণিক আত্মবিভ্রমকে লজ্জা দিয়ে ভ্রূকুটি করেছিল নয়ন, বলেছিল—

—দেরী করছেন কেন? বাড়ী চলুন?

এমন করে বলেছিল, যেন এই বিলম্ব তাকে আঘাত করছে, অসহিষ্ণু লাগছে তার দাঁড়িয়ে থাকতে। বাড়ী এসে প্রথমেই স্নান করে নয়ন একখানি সাদা শাড়ী পরেছিল। চুলে পরেছিল ফুল। চা খেতে বসে বলেছিল—

—স্নান না করলে মরেই যেতাম! যে গরম!

তখন সেই মেয়েটির সামনে বসে সহসা বিনুর মনে হয়েছিল সে যেন বড্ড বেশী লম্বা রোগা আর একহারা। চুলগুলি অবাধ্য! নিজের সম্বন্ধে এত কথা তার আগে মনে হয়নি।

নয়ন নিজেকে ঘিরে যে বৃত্ত রচনা করে রেখেছিল তাতে বিনুকে যদি প্রবেশ করতেই হয় তবে অপেক্ষা করতে হবে। অমলের ছোট ভাই অমৃত, কৃতবিদ্য কৃতী ছেলে, সেই ত প্রথম। বিয়েটা তার কাছে মনের এবং প্রাণের দাবী নয়। অঙ্কের ছাত্র সে। হিসেব করে দেখে, যে বিবাহ তাকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে, জীবনকে সম্মান দেবে, সেই বিবাহ করতে চায় অমৃত। তার পরীক্ষায় নয়ন পাশ করেছে। নয়নের দিক থেকে কোন সাড়া থাক না থাক, অমৃতের অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।

শুধু অমৃত বলে নয়, নয়ন নিজেই যেন এক নিষেধ। ব্যবহারের এতটুকু তারতম্যে তার নাক কুঁচকে যায়, মুখে ফুটে ওঠে বিরক্তির রেখা। স্বল্পভাষিণী নয়ন, নিরুত্তাপ তার ব্যবহার। বিনুর সঙ্গে সে গল্প করেছে, সিনেমা দেখেছে, একলা বাড়ীতে তাকে খেতে দিয়েছে, তৃপ্তির সাময়িক অনুপস্থিতির সময়ে গৃহিণীপনা করে বিনুকে আরো খাবার জন্য পীড়াপীড়িও করেছে। তবু সহজ পরিচয়ের মাত্রা কাটিয়ে এতটুকু আপন হবার সুযোগ দেয়নি। এক বছর কেটেছে, দুই বছরও কাটল ব'লে। কতবার এল আর গেল নয়ন। কত কথা হলো। শুধু যে কথাটি বিনুর ছন্নছাড়া মনের একান্ত সরোবরে রক্তকমল হয়ে ফুটল, তাকে কোনদিন মালিনীর কাছে পৌঁছাতে পারল না বিনু। এ মেয়ে যেন শুধু

দেখবার আর ভালবাসবার। তার মন যদি বা থাকে, তা বিন্নুর জন্য নয়। তাই এই ভালোবাসা বিন্নুকে আবার ছন্নছাড়া করল।

সে এক দীপান্বিতার দিন। পশ্চিম ভারতের শ্রেষ্ঠ উৎসব। দেওয়ালীতে মহারাষ্ট্রের মেয়েরা সাজবে ফুলে কুঙ্কুমে রঙীন কাপড়ে। আলপনা দিয়ে প্রিয়জনকে সম্ভাষণ জানাবে। গুজরাটের মেয়েরা উৎসবে গাইবে, নাচবে গরবা নাচ। রঙীন ঘাঘরার প্রান্তে প্রান্তে নূপুর বেজে যাবে, বেণীতে দুলবে ফুল, কাজল চোখের বাঁকা ছুরিতে জখম হয়ে যাবে অনভিজ্ঞ দর্শক তরুণ যুবকের মন।

তেমনি একদিনে বিন্নু হঠাৎ জানল তার ছুটি। তার সহকর্মীরা মধুর সব পরিকল্পনা করতে ব্যস্ত। শাঠে আর প্যাটেল চলে গেল নাদিয়াদে। সমস্ত দিনটা তার সামনে। ঘরে ফিরতে ফিরতে বিন্নু ভাবল—ঘর ঘর বলি, কিন্তু এও তো আমার ঘর নয়? কোথায় কোন্ ঘরে ফিরবে বিন্নু। দুনিয়াতে তাকে কারো প্রয়োজন নেই। ছুটি তার কাছে বোঝা। আজ যদি নয়ন থাকতো। নয়ন আছে বরোদায়।

সে যদি আজ বরোদায় যায়? কতো গাড়ীই তো আছে। স্টেশন থেকে একখানি টাঙ্গা নেবে। অধ্যাপক নিবাসের একান্তের ফ্ল্যাটখানিতে পৌঁছে কড়া নাড়বে। নয়ন এসে দরজা খুলে দেবে। তখন সে কি বলবে? বলবে—নয়ন, তোমার সঙ্গে আমার দুই বছরের পরিচয়। দেখা হয়েছে তিন সপ্তাহ আগেই। অনেক সময় বয়ে গেছে, কিন্তু দেখ, সে সময়ও সময় নয়। সময় হচ্ছে এখন এই মুহূর্তটি। মনের কথা বলব নয়ন, আমি তোমাকে ভালবাসি।

সত্যি সত্যিই গেল বিন্নু। চা খেতে খেতে অনেক লোকের মধ্যে নয়নকে একান্ত ক'রে বলল—

—অনেক কথা আছে নয়ন, সন্ধ্যে বেলা বলব।

নয়ন বিস্মিত হ'ল না। বলল—বেশ তো।

সন্ধ্যায় যখন বাতি জ্বলেছে ঘরে ঘরে, যখন আলো দিয়ে সাজিয়াছে বাড়ীগুলি, ফুলের মালা বেণীতে জড়িয়ে হেসে হেসে যখন মেয়েরা চলেছে পথ দিয়ে, তখন সেজে এল নয়ন। বলল—চল।

বাড়ীর পাশেই কামাটিবাগ। সেখানে আসতে এত সেজেছে কেন নয়ন? আড়চোখে দেখল বিনু—ঘাসের মত সবুজ শাড়ী, পরেছে গৌর তনু ঘিরে। টুকটুকে লাল চোলী পরেছে, টানটান করে চুলে বেঁধেছে মস্ত খোঁপা। চুলের পাশে ফুলের আভাস।

মস্তবড় বাগানখানার একান্তে, যেখানে কয়টা দেবদারু গাছ অগণিত পত্রাঞ্জলিতে সন্ধ্যাকে প্রণাম জানাচ্ছে, সেইখানে বসল তারা। দুজনেই চুপচাপ। পথ হাঁটবার ক্লান্তিতে ঘনঘন নিঃশ্বাসে উদ্বেলিত নয়নের বুক। মুখখানা লাল। বিনুর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে তাকাল।

কি বলবে বিনু? কোথায় গেল তার সেই সাহস? সেই সংকল্প? এই যে মেয়েটি নির্লিপ্ত হয়ে বসে আছে, তার অসহিষ্ণু প্রশ্নের জবাবে কি বলবে সে? বিনু শুধু ঘামতেই লাগল। বলল—

—অনেকদিন আমেদাবাদ যাওনি···নয়ন তাকিয়ে রইল। বিনু বলল—

—তোমাকে বলব মানে······

নয়নের মুখে ধীরে ধীরে ঘৃণার কুঞ্চিত রেখা ফুটতে লাগল। যদি সাহসী হয়ে উঠতে হয় তবে এই সেই সময়। বিনু আর বুঝি সময় পাবে না। এই মুহূর্তটাই সত্যি। কিন্তু পারছে না বিনু সাহসী হ'তে। পারতো, যদি এতটুকু ক্ষমা থাকতো ঐ সুন্দর মুখে আর স্থির দৃষ্টিতে। তবু বিনু বলল,···নয়ন···আমি তোমাকে···

নয়ন উঠে দাঁড়াল। তারপর সহসা সেই শান্ত পরিবেশকে ব্যঙ্গ করে হেসে উঠল। অকারণ নির্মম উল্লাসের সেই মধুর

উচ্চহাসিতে চকিত হ'ল সন্ধ্যা। হাসির পর হাসির ঢেউ। যেন হাজার হাজার গোলাপী কাঁচের গেলাস ভাঙ্গছে নিক্কণে। মর্মাহত, বিমূঢ় বিনু সেই হাসির সামনে দাঁড়াতে পারল না। চলে এল। তাকে অনুসরণ করে ফিরতে লাগল নয়নের সেই হাসি।

আর এতটুকু দেরী নয়। নয়ন আসবার আগেই বিনু চলে যাবে তার অপমান আর লাঞ্ছনা নিয়ে। নির্জন রাস্তার বাড়ি-গুলোও যেন তার লজ্জার কথা জানে। চারদিকে শুধু আলো আর আলো। এই আলোতে সবাই দেখতে পাবে বিনুর রক্তাক্ত হৃদয়কে উন্মুক্ত-করে। তাই বিনু চলে যাবে।

নয়নের বাবা আর ভাইবোনেরা কি মনে করেছিলেন কে জানে! সে তার ব্যাগটা নিয়েছিল—জরুরী কাজ আছে বলে কি একটা বলেছিল, নয়নের মা নির্মম সমালোচকের মত বিরক্তি নিয়ে তাকিয়েছিলেন। তৃপ্তিদের পেয়িং গেষ্ট এই ছেলেটার এলোমেলো ভাব আর ছন্নছাড়া ধরণ তিনি মোটেই দেখতে পারেন না। কেনই-বা এসেছিল আর কেনই বা চলে যাচ্ছে, এই গোছের কোন একটা মন্তব্যও তিনি করলেন।

ট্রেণের চাকায় চাকায় যে শব্দ, তাতে-ও যেন কার হাসি। বিনু পালাতে চায়। কিন্তু কোথায় পালাবে। কি অসম্ভব মূঢ়তা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, কি দুর্বুদ্ধি তাকে ভর করেছিল, কেন সে এসেছিল আজ?

একটি নিখুঁত গৃহস্থালীর পটভূমিকাতেই নয়ন সম্ভব। তাকে প্রেম জানাতে গিয়েছিল সে? এই তো ট্রেণের জানলার কাচে নিজের চেহারা দেখতে পাচ্ছে সে! কি আছে তার! নিজের পরিবারের বিফল মানুষ বিনু। জীবনে সবদিকে পরাজিত সে, একটা বিদেশী কোম্পানীর হয়ে কাজ করে আড়াই শো' টাকা পায় শুধু। নিজে যে জীবনে একজন পরাজিত লোক তা তো আগে জানেনি বিনু। এত যে প্রতিযোগিতা আছে তাই কি সে

জানত? টাকা আর পদমর্যাদা, যশ আর প্রতিষ্ঠা—এত রকমের পাল্লা দিয়ে ভালোবাসা সম্ভব হবে না। তার চেয়ে পালিয়ে যাওয়া ভালো। কিন্তু নয়ন হাসল কেন? কেন ক্ষমা করল না? কেন বলল না—জানি কি বলতে চাও?

শুধুই পটে আঁকা ছবি নয়ন, সেই দেহে হৃদয় নেই।

আমেদাবাদে এসেই বিনু অফিসে গেল। বলল—আমাকে বদলি করে দাও, যেখানে হোক। তিনদিন বাদে খবর এল, তাকে বদলি করা হবে বম্বে। অমলবাবু দুঃখ করলেন। সুদূর প্রবাসের এই ছেলেটি দুই বছরের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল তাঁর কাছে। হঠাৎ কি হল তার, কেন এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি। শুধু দুঃখ পেলেন। বললেন—যখন যেখানে থাকো, খবর দিও। ভুলো না।

তৃপ্তি কিন্তু অত সহজে মেনে নিল না। বলল, বলতেই হবে তোমার কি হয়েছে। আমাকে তুমি বল—কতবার বলেছ আমি তোমার দিদির মত। তাই যদি হবে তো বল কেন এমন হঠাৎ ছেড়ে যাচ্ছ।

বিনু হেসে এড়িয়ে গেল। বলল—বম্বেতে আমি গেলে আপনিও কদিন থাকতে পারবেন গিয়ে। এক জায়গায় পড়ে আছেন তো?

পরদিন যখন সবাই চা খাচ্ছে, তখন এল নয়নের চিঠি। তৃপ্তির নামে। চিঠিখানা হাতে করে পড়তে পড়তে তৃপ্তি শোনাল—

—সুবিনয়বাবু সহসা চলে যাওয়াতে খুব অবাক হয়েছি—

না শুনেই উঠে গেল বিনু। তৃপ্তি বলল, তোমাকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছে—শুনেই যাও—

পাশের ঘর থেকে সময় নেই ব'লে হেঁকে চলে গেল বিনু।

শান্তি নেই কোথাও। বম্বেতে গিয়ে এমনি প্রাণপণে খাটতে লাগল বিনু, যে সহজেই খুশি হলেন ম্যানেজার। কিছু পদোন্নতির সঙ্গে তাকে ভার দিলেন বিভিন্ন শাখাগুলিতে কাজ তত্ত্বাবধানের। এদিকে মহীশূর মাদ্রাজ ওদিকে দিল্লী আগ্রা, সর্বত্র ঘুরতে লাগল বিনু। তার উন্নতিতে খুশি হয়ে দাদারা লিখলেন—এবার বিয়ে কর। তৃপ্তি জানাল—এমন দিন যায় না যে তারা বিনুর কথা বলে না। এমন কি কাজ বিনুর যে একবারও আসতে পারে না? খোকনের কথাও কি তার মনে পড়ে না?

মনে বিনুর অনেক কথাই পড়ে। বাইরেটা বিনুর এলো-মেলো, মনটা তার গভীর। তার মণিকোঠায় কত কথা বাসা বেঁধে আছে, তাদের কি বিনুই চেনে? না তারা বিনুর শাসন মানে? কত জ্যোৎস্নার আকুল নিশীথে কত ঘুমের মায়া দোলনায় কোথা থেকে সেইসব কথা উঠে আসে—বিনুর স্মৃতির দরজায় ঘা দিয়ে দিয়ে পাগল করে তাকে।

চিরপ্রবাসী জীবন তার কোন দিন নীড় জানল না। শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায় সাথীহারা ঘরে বসে তার মন যদি প্রবাসী পাখীর মত কোনো অরণ্যের শান্ত ছায়াতল কামনা ক'রে থাকে, সে কামনা তার মনে মনেই থাক। দ্বিতীয়বার হাসির পাত্র হবে না বিনু। আজকাল সে নিজেই হাসতে শিখেছে, কথা বলতে আর কাজের মানুষ হ'তে শিখেছে। এই মুখর ব্যক্তিত্ব তার বর্ম। কত সুন্দর মেয়ে দেখল বিনু। বম্বের শান্তা, জীবিকার তাগিদে যে চাকরী করছে তাদের অফিসে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-সুলভ গৌর দেহ, সরল সুন্দর মুখশ্রী, আর নম্র স্বভাব শান্তার। বিনুকে সে সাদরে আমন্ত্রণ করেছিল নিজেদের স্বল্পবিত্ত পরিবারের নিরাভরণ আতিথ্যের মধ্যে। তার মা সস্নেহে তাকে যত্ন করেছেন, শান্তা শুনিয়েছে গান। চলে আসবে জেনে শান্তা তাকে বিদায় জানাতে গিয়েছিল। দুই চোখে জল ভরে এসেছিল তার। শান্তার

হৃদয় সহজেই বন্ধুর জন্য ব্যথিত হয়। সেই হৃদয়ে একদিন আশার দীপ জ্বলবে কোনো অনাগতের পথ চেয়ে। সেই আলো ধরে বিনু শান্তাকে না চিনুক তাতে ক্ষতি নেই। তাছাড়া এখানে ওখানে কত মেয়েকেই সে দেখল। কতো দেশের আর নামের। লক্ষ্ণৌএর শকুন্তলা, যার শ্যামল মুখে দুটি ভ্রমর চোখ সরল বিশ্বাসে চেয়ে থাকত বিনুর দিকে। সে ত একদিন আত্মনিবেদন করতেই এসেছিল—বিনুই পালিয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণা আর শিরীণ। ফ্লোরা আর দেবকী, ইচ্ছে করলে কোথাও কোথাও পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হ'তে পারত বই কি। কিন্তু সে মন বিনুর নেই। একখানি মুখই জানে বিনু। যার মুখখানি সুডোল, ঘৃণা আর বিরক্তিতে যার মুখে ক-টি রেখা পড়ে। যে মেয়ে ছবির মত সুন্দর, আর যার হৃদয় নেই, তার কথাই মনে পড়ে বিনুর।

ভাগ্যচক্রে আবার সেই সমস্যা দেখা দিল। কোথায় যাবে কি করবে! ভেবে ভেবে সে চলল তৃপ্তির কাছে। তৃপ্তি এখন গোয়ালিয়রে।

টাঙ্গাটা যখন থামল শহরের একান্তে কাম্পূ ময়দানের সংলগ্ন পাথরের বাড়ীটায়, তখন আশা আর অধৈর্য নিয়ে কড়া নাড়ল বিনু। এখনি আসবে তৃপ্তি, নয়তো অমল। দেড় বছরে ছেলেটা কত বড় হ'ল কে জানে? চটি চটপট করে কে যেন নেমে আসছে। চুলটায় আঙুল বুলিয়ে দাঁড়াল বিনু, আর দরজা খুলল নয়ন।

কয়েকটি নিশ্চল মুহূর্ত। নয়নের মুখে বিস্ময় আর অবিশ্বাস। বিনুই ভাঙল বিহ্বলতা। বলল—তৃপ্তিদি কোথায়? অমল দা?—

—তাঁরা তো নেই, বেড়াতে গেছেন।

—ও, তবে আমি আসি—পরে আসব—

—পরে আসলে শাস্তি পাবে—বলে পেছন থেকে হৈ হৈ করে উঠে এল তৃপ্তি আর অমল। তৃপ্তি বলল—কি ছেলে, কি ছেলে! এতদিনে মনে পড়ল?

কথায় বার্তায় কখন চলে গেছে নয়ন। অমল বলল, চলো ভেতরে চলো।

তাকে ঘরে এনে জিনিসপত্র গোছাবার ফাঁকে ফাঁকে তৃপ্তি অনেক কথাই শোনাল। নয়ন এসেছে বেড়াতে তাও জানাল। মুখ টিপে বলল—আদর দিয়ে দিয়ে মাসীমা মেয়েটিকে মাথায় তুলেছেন। কোন কিছুই পছন্দ হয় না তাঁর। কি এমন রূপসী, কি এমন আশ্চর্য মেয়ে। অমৃতের মত ছেলে সাধাসাধি করছে, তবু মেয়ে কথা দিচ্ছেন না। এবার দেবে আর কি! অমৃতের দারুণ একটা উন্নতি হল তো! এমনি আরো কত কথাই বলল তৃপ্তি। সব কানে গেল না বিনুর। বেশ তো তবে নয়ন বিয়ে করছে অমৃতকে। কতটুকুই বা জানে বিনু অমৃতকে। তবু আশা করা যায় ওরা সুখী হবে। সেই জন্যেই সেদিন হেসেছিল নয়ন? বিনুর প্রস্তাব তার কাছে মনে হয়েছিল স্পর্ধা?

কিন্তু এ কি আচরণ বিজয়িনীর? বিজয়িনী যদি হবে তবে কেন নিজেকে এমন করে লুকিয়ে রেখেছে নয়ন? অথবা এ-ও তার অবহেলা?

সন্ধ্যাবেলা তারা বেরোল। আন্দোলিত ভূমির ওপর ছবির মতো সুন্দর দীপান্বিতার গোয়ালিয়র। একান্তে তার ছোট একটি টিলা। তার ওপরে বসবার বেদী। হেমন্তের কুয়াশার স্বপ্নের ওড়না গায় জড়িয়েছে রাত্রি। অমাবস্যার আকাশের তারার মতো দীপের মালা নগরীর অঙ্গে। অন্ধকারও যেন মিঠে। এই আঁধারে সিগারেটের আলোয় এতটুকুও দেখা যাচ্ছে না নয়নের মুখ। তবু বিনু চেয়ে রইল।

অমল বলল— গান করো নয়ন। এখনো শ্যালিকা আছ অনুরোধ মানবে, দুদিন পরে আমার সঙ্গে তোমার নিষেধের সম্পর্ক। গান গাও—

নয়ন আস্তে গান ধরল—

'কেন আমায় পাগল করে যাস্—
ওরে ও-চলে যাওয়ার দল—
আকাশে বয় বাতাস উদাস পরাণ টলমল—'

এই গান কেন গাইছে নয়ন? কাকে কি কথা শোনাচ্ছে সে? যারা চলে যায় তারাই কি তাকে উদাস করে গেল? যে থাকবে তাকেই তো পাবে নয়ন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হবার কোনো আশঙ্কাই তো নেই। তবু আজ অন্ধকারে এই গর্বিত মেয়েটির কণ্ঠে এই আকুতি কেন? শীতের হাওয়ায় পাতা ঝরেছে বনে, আমলকী বন উত্তাল, তাতে সভা তো ভাঙে নি নয়নের! শেষ বীণাতে চঞ্চল তালের কথা কেন বলল নয়ন? তার সভা তো সবে শুরু। সেখানে শুধু দুইজন। বীণা আর গান। চির উৎসব।

গান থামতে সব নীরব। তখন ভীরু পাখীর মতো একটি কোমল হাত সন্তর্পণে বিনুর হাতে এসে থামল। সেই হাত বিনু চেনে। অনামিকায় তার আংটি। বিনু জানে আংটির পাশে একটি তিল আছে। সঙ্গে সঙ্গে বিনুর বুক উত্তাল হয়ে উঠল, বিস্ময়ে—কৌতূহলে।

এক আশ্চর্য শুভলগ্ন। সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে প্রেমধন্যা অরুন্ধতীর আশীর্বাদ ঝরে পড়ছে—আকাশ বাতাস কোন সম্ভাবনায় থরো থরো বুক।

জীবনের স্বপ্নমদির মুহূর্তগুলিকে দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখতে পারলে কি হ'ত কে জানে। তবু স্বপ্ন ভেঙে যায় রূঢ় আঘাতে। এই নিয়ম। সেইজন্যই হয়তো সহসা তৃপ্তি বলে উঠল—ঠাণ্ডায় জমে গেলাম বাবা, বেজায় ঘুম পাচ্ছে। বাড়ী চলো।

ছিটকে সরে গেল হাতটা। পরম কোনো লগ্ন গোপন পদ-সঞ্চারে কাছে এসেছিল, তাও যেমন তৃপ্তি জানে না, তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে বলে-ও তার জানা নেই। তাই সে ঢেকুর তুলে আবার বলল—

—বিন্নু আর নয়নের বুঝি শীত নেই ? কাঁচা বয়েস কি না!

সেই থেকে বিন্নুর মন রইল অধীর হয়ে। বাড়ী ফিরছে যখন তখন নয়ন রইল পিছিয়ে। বাড়ী এসে সোজা চলে গেল ওপরে।

রাত যখন অনেক, তখন বিন্নু সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। বাইরের বারান্দাটি ভারী সুন্দর। জাফরী কাটা ঝরোখা। রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল বিন্নু। চাইল সুপ্ত নগরী আর বিচিত্র আকাশের দিকে। এমনি ধারা পরিবেশে, একজন মানুষ যদি আকাশের মুখোমুখি দাঁড়ায়, অসম্ভব কল্পনায় মন ভাসিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় তখনই। বিন্নুর মনে হল এই এক আকাশ দেয়ালীর নীচে তার অস্তিত্ব যেমন নগণ্য, জাগতিক জীবনেও তার ঠাঁই ততখানিই ছোট। অনেকদিন ধরে একটি মেয়েকে তিলে তিলে ভালোবাসা, তুনিয়ার চোখে সেও হয়তো মস্ত একটা অপচয়। সেই বোকামিই করেছে বিন্নু। তাতেই তার মুক্তি। কিন্তু নয়ন কেন তাকে পদে পদে এমন আত্মসচেতন করে ? যে ভালবাসা তার কাছে আকাশ, তার থেকেই বারবার নির্বাসিত করে নয়ন। নগণ্য একটা মানুষ তাকে ভালবাসে, তাতে কি নয়নের লজ্জা ? তাই যদি হবে তাহলে আজ সন্ধ্যায় কেন সে অমন করে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ? এ কি খেলা নয়নের, অথবা কৌতুক ?

সহসা সমস্ত ইন্দ্রিয় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে উঠল বিন্নুর—বারান্দার অপর প্রান্তে দরজায় হেলান দিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে কে ? সন্ধ্যার উদ্ধত কবরী এখন বেণীতে বিস্রস্ত। শাদা শাল লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। বিন্নু চেয়ে রইল।

'আমার নয়ন তোমার নয়নে মনের কথা খোঁজে—' আস্তে আস্তে নক্ষত্র খচিত আকাশ-অঞ্চলা অমাবস্যা নিশীথিনী ও পৃথিবী সব কিছু বিলুপ্ত হল বিন্নুর সামনে থেকে। জগৎ শুধু তুটি চোখের কালো তারায়। যে চোখ তার দিকে চেয়ে আছে।

পুনর্বার সমাগত শুভলগ্ন। এই সময়ে এতটুকু সাহসী হোক বিনু—একবার সাড়া দিক। কিন্তু সাহস হল না তার। সে বিমূঢ় হ'য়ে চেয়ে রইল। তার এই ভীরুতাকে তিরস্কার করে যখন নয়নের মুখে আর চোখে ঘৃণা ফুটে উঠছে, তখন ঘরে পালিয়ে চলে এল বিনু।

পরদিনই গোয়ালিয়র ত্যাগ করল বিনু। অমলকে আর তৃপ্তিকে জানাল না, অপেক্ষা করল না কারো সাথে দেখা করবার জন্য।

এই মহাকাশের তারাগুলি একটি অদৃশ্য নিয়মে নির্দিষ্ট স্থানে রয়েছে। যদি কখনো তারা কক্ষচ্যুত হ'য়ে খসে পড়ে তাহলে অবশ্যম্ভাবী বিনাশ।

বিনু-ও তার জীবনের ভারকেন্দ্র থেকে ছিটকে গেল। নিজেকে বাঁচাবার এতটুকু চেষ্টা করল না। প্রথমে কিছুদিন পাগলের মতো ঘুরে বেড়াল এখানে ওখানে সেখানে। ছ-মাস বাদে ফিরল যখন তখন ধূলো পড়েছে নয়ন এবং অমৃতের বিয়ের চিঠিখানায়। খুলে অবধি দেখলনা সে। মনে হল অবহেলে নষ্ট করেছে জীবনের শ্রেষ্ঠ ক-টা দিন। তাহলে জীবনটাকে মুঠো করে ধরা যাক। চাকরী ছেড়ে ফাট্‌কা ধরল। টাকা এল জলের মতন। মদ খাওয়া ধরল। বন্ধুবান্ধব এবং কিছু বান্ধবী জুটল রৌপ্যচক্রের পাশে মুগ্ধ মধুমক্ষীর মত। অনেক টাকা ঘেঁটে, অনেক জীবন দেখে তৃপ্তি পেলনা বিনু। তৃপ্তি নেই। শান্তি নেই। কিন্তু থামতেও পারে না সে। থামলেই তার শূন্য জীবনটা যেন হাহাকার করে ব্যঙ্গ করবে তাকে। নিজের সঙ্গে নিজেই বাজী ফেলেছে বিনু। এই রেসের কোথাও তাকে থামতে নেই।

টাকা এল, টাকা গেল, বন্ধুবান্ধব অন্তর্হিত হল, তবু বিনু থামল না। স্বাস্থ্য গেল, মন গেল, সব গেল, মানুষ তার সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হলো। বিনুর নিজের কথা ভাববার সময় নেই।

সময় হল দু-বছর বাদে। মোটর চালাতে গিয়ে ধাক্কা লাগল

বিন্নুর। জান বেঁচে গেল কিন্তু কাঁধের হাড়ে চোট লাগল। বুকে ধরল ব্যথা। এক্স্-রে নিতে গিয়ে আরো অনেক ক্ষতির ছবি ধরা পড়ল। অতর্কিতে কখন মৃত্যু কাছে এসেছিল। বিন্নুর তুই ফুসফুসে তার পাঞ্জার ছাপ রেখে গেছে।

বিন্নুর বড়দা তাকে নিয়ে গেলেন। হাসপাতালে রাখলেন। নির্জন অবসরে আবার যত দুশ্চিন্তা আসে। বহু দিনের কথা। আবার ফিরে আসে। মৃত্যুর পদধ্বনি যেন কার হাসিতে শুনতে পায় বিন্নু।

বিধি-নিষেধ অমান্য করে সে অত্যাচার শুরু করল। বেঁচে থাকাই জগতের নিয়ম। সে নিয়ম বিন্নু মানবে না। চিকিৎসায় রোগ মুক্তি হতে পারে জেনেও বিন্নুর এই দুর্বোধ্য আচরণ। ডাক্তার জানালেন তার দাদাকে। দাদা অনুযোগ করলেন। কত বোঝালেন।

বললেন—ভাওয়ালী চল। সেখানে গিয়ে অনেকে সেরে গেছে—, নয়তো পেণ্ড্রারোড।

বিন্নু মেনে নিল। কদিন পরেই যাবে সে। একাই যাবে। যেতে হলে ভাওয়ালী নয়, ডাক্তারের কথামত দিল্লী থেকে উত্তরে গিয়ে পাহাড়ের সীমান্তে একটি নতুন স্যানাটোরিয়মে যাবে। ডাক্তার গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারেন, দু-বছরেই বিন্নু কর্মক্ষম হয়ে উঠবে।

মাঝ পথের ষ্টেশন। রাত বারোটা হবে। প্ল্যাটফর্মে বসে আছে বিন্নু। এবার সেরে উঠবে হয়তো। সেরে উঠলে বড়দা'র কথামত বিয়ে করবে বিন্নু। শান্ত একটি মেয়ে। যে শুধু তাকেই ভালবাসবে, তার শুভ কামনা করবে, তার কল্যাণে সন্ধ্যায় দীপ জ্বেলে কপালে সিঁদুর পরে, চিরুণীর সিঁদুরটুকু আঙুলের ডগায় নিয়ে লোহায় ছোঁয়াবে। সাধারণ সুখ আর স্বপ্ন দিয়ে সাধারণ একটি ঘর বাঁধবে বিন্নু।

জ্বর বাড়লেই এইসব স্বপ্ন আসে। সবটাই স্বপ্ন। সামনেই যে গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে, তার ফার্ষ্ট ক্লাশের কামরার কাঁচের জানালায় একটি মেয়ের মুখ। সেই মুখখানাও নিশ্চয় স্বপ্ন। সহসা বিন্নুর বুকে একটা ধাক্কা লাগল। স্বপ্ন যদি হবে তবে কেন মেয়েটি তাকে ডাকছে? ···উঠে এগিয়ে গেল বিন্নু। জানালায় হাত রাখল—আর নির্বাক তাকিয়ে রইলো। কয়েকটি নিস্তব্ধ মুহূর্ত। তারপর অনেকগুলি প্রশ্ন দুরন্ত কৌতূহলে ঢেউয়ের মতো উঠে এল বিন্নুর মনে—একলা কোথায় চলেছে নয়ন? গাড়ীতে আর কেউ নেই কেন? রক্তহীন শীর্ণ মুখ, প্রসাধনে নৈপুণ্য নেই—কি হয়েছে নয়নের? তারপর ধীরে সব কৌতূহল স্তিমিত হয়ে থেমে গেল।

—তুমি?

—তুমি কোথায় চলেছ?

—আগ্রায়।

—অমৃতবাবু সেখানে আছেন?

—হ্যাঁ। তুমি কোথায় চলেছ?

—নওয়াপুরা।

—কেন?

—নাইবা শুনলে—

নয়ন সন্তর্পণে, কোমল মমতায় বিন্নুর হাতের ওপর হাতখানি রাখল। বলল—এত রোগা হয়ে গেছ?

বিন্নু হাসল। ধীর, শান্ত হাসি। অভিযোগ নেই, অস্থিরতা নেই—শুধু চেয়ে থাকতে চায় বিন্নু। এই লগ্নটির আর পুনরাবৃত্তি হবে না।

চেয়ে থাকতে থাকতে নয়ন বলল—জানো, তোমার কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। —ভীরু কণ্ঠ। একান্তে যেন মনের কথা কইছে নয়ন।

সহসা অতর্কিতে বিন্নু বলল—আমার যে রোজই মনে পড়ে।

হাত সরিয়ে নিল নয়ন বিদ্যুৎ বেগে। মুখখানা রক্তিম হয়ে উঠে পাণ্ডুর হয়ে গেল। বিস্ফারিত চোখে, বিস্মিত কণ্ঠে সে বলল—

—কি বললে ?

—রোজই মনে পড়ে—

সহসা কেঁদে উঠল নয়ন। আর্তনাদ স্বরে বলল—

—আগে কেন বলোনি ? ···আর যদি বলোনি, আজ কেন বললে—

সে কি কথা ? গাড়ীতে উঠল বিন্নু। কৌতূহলী সহযাত্রীদের কথা তার তখন মনে নেই।

বলল—চুপ করো নয়ন, দুটি পায়ে পড়ি—

কে চুপ করবে ? হাহাকার করে কান্নায় কান্নায় ভাঙতে লাগল নয়ন—

—আগে কেন বলোনি ? কেন ? কেন ? চারবছর ধরে অপেক্ষা করেছিলাম—কেন আমার জীবনটা তুমি নষ্ট করে দিলে ? কেন ?

কার জন্য অপেক্ষা করেছিল নয়ন ? এতদিন পেরিয়ে এসে এ কি অসম্ভব রূপকথা ? সমস্ত দুনিয়া বিন্নুর চোখের সামনে নাগরদোলার মতো ঘুরে যেতে লাগল। নিঃশ্বাস আটকে এল, পায়ের তলায় কাঁপতে লাগল মেঝে। অনেক চেষ্টায় বিন্নু বলল—

—আমি বুঝতে পারিনি নয়ন।

নয়ন কোন কথা মানল না। দুর্বার আবেগে সমস্ত দেহ তার থর থর করে কাঁপতে লাগল আর বারবার সে একই কথা বলতে লাগল—

—কেন বলোনি ? এতদিন কেন বলোনি—যদি বলোনি আজ কেন বললে—কেন ? কেন—

বাঁশী বাজল। তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ীটা দুলে উঠল। হতচকিত বিমূঢ় বিন্নু নেমে পড়ল। জানালার কাঁচে মাথা রেখে তখনো নয়ন কাঁদছে।

নওয়াপুরা পৌঁছান বিন্নুর আর হলো না। ডিসেম্বরের শীতে স্যানাটোরিয়ামের লেবেল আঁটা জিনিসপত্রগুলোর পাশে জ্বরে আচ্ছন্ন বিন্নুকে রেলওয়ে হাঁসপাতালে নিয়ে এলেন পাঞ্জাবী ডাক্তার। কলকাতায় তার দাদাকে টেলিগ্রাম করলেন।

দাদা যখন পৌঁছলেন, তখন বিন্নুর জ্বর সমানে উঠছে। ফুসফুস চেপে আসছে শ্বাস রোধের অনুভূতিটা। নিশ্বাস নেবার বাতাসই পাচ্ছে না বিন্নু।

কি যে বলছে বিন্নু, কাকে যে খুঁজছে, বুঝ্‌তে পারলেন না বিন্নুর দাদা। ছোট ভাই হলে-ও দীর্ঘদিনের মানসিক ব্যবধানে সে তাঁর অপরিচিত মানুষ। একেবারেই একজন তৃতীয় ব্যক্তি।

কষ্ট তো লাঘব করতে পারবেন না, তবু যদি তার কথা বুঝতে পারতেন—

যদি তার কোন শেষ ইচ্ছা থাকে, কোন কথা থাকে কোথাও পৌঁছে দেবার!

জ্বর উঠল একশো ছ-এ। তারপর হু হু করে নামতে লাগল। ডাক্তার উঠে গেলেন। বিন্নু তখন ভারী সুন্দর হাসল। দাদা বললেন—

—বিন্নু শুনতে পাচ্ছিস?

—আমি বুঝতে পারিনি নয়ন—

—কি বিন্নু?

—তোমার যে মন আছে—

শেষের কথাগুলি নিজেকেই শোনাল বিন্নু। দাদা শুনতে পেলেন না। তিনি উঠে গেলেন সাশ্রু নয়নে। পরম শান্তিতে

তখন চুপ করেছে বিন্নু। নয়ন ত' শুধু পটে লেখা ছবি নয়—তারও মন আছে। এই সান্ত্বনা কোমল স্বপ্নের মত আচ্ছন্ন করল বিন্নুর শেষ চেতনা। কি বলিষ্ঠ বাহুতে তাকে ঘিরে ধরল সেই সান্ত্বনা। গভীর মমতায় বন্ধ করে দিল তার দুই চোখ।

জলে ঢেউ দিওনা

গোয়ালন্দ-ঘাট থেকে কালীগঞ্জ স্টীমার সার্ভিসে উজিয়ে গিয়ে নগরবাড়ী, নটাখোলা বা আর্চিয়া স্টীমার-স্টেশন থেকে ক' মাইল ভেতরে যে গ্রাম, প্রায়শঃ তাতে যাবার পথ ছিল খাল বা নদী বেয়ে। প্রবাসী আমরা প্রায়ই গ্রামে যেতাম পুজোর সময়ে। আষাঢ় শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বারিধারা বুকে সঞ্চয় করে যে পদ্মা ফুলে ফেঁপে উঠেছিল, উন্মত্ত কৌতুকে যে গ্রাস করেছিল কত গ্রাম কত তটভূমি, যার ঘোলাজলের পাক দেখে ভয় পেতো না শুধু জেলে মাঝি আর সারেং, আমরা দেখতাম তাকে শান্ত, সুন্দর। ধূ-ধূ এপার ওপার ঘোলাজলের একখানা বিস্তৃতি। গ্রামের স্টীমার স্টেশান যখন দূরে চোখে পড়ত তখন যাত্রীদের মুখে মুখে শুনতাম—এবারও স্টেশান ভেঙেছিল।—দেখলে কিন্তু মনে হয় না।—সারাল কে? —প্রসন্ন চৌধুরী। তখন মুখে মুখে সবাই বলত তাঁর কথা। তিনি ছাড়া গ্রাম বাঁচতো না। তাঁর প্রতাপেই গ্রামে অন্যায় অধর্ম হতে পায় না। সিংহাসনের সান্ন্যালরা চক্রান্ত করে এবারও আমাদের গ্রামের বড়হাটের হাটুরেদের ভাঙিয়ে নিয়েছিল প্রায়, কিন্তু মাঝখানে গিয়ে পড়লেন প্রসন্ন চৌধুরী। বেয়াদবী করতে চেয়েছিল যারা, তাদের কাছারীতে আনিয়ে নাকে খৎ দেওয়ালেন। এজমালীর খরচে হাটের জন্যে পাকাপাকি টিনের চালা দোকান, বাঁশের আগড় দিয়ে বেড়া, জল খাবার জন্যে টিউবওয়েল, কূয়ো—সব করিয়ে দিয়েছেন প্রসন্ন চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে কার তুলনা?

স্টীমার যখন ঘাটের কাছে আসত, ঝন্‌ঝন্ শব্দ করে ময়াল

সাপের মতো মোটা লোহার শেকলটা গড়িয়ে পড়তো জলে, পাড়ের ফ্ল্যাট আর স্টীমারের মাঝে তক্তা পড়তো। খালাসীরা ছুটোছুটি সুরু করতো। তখন চোখে পড়তো পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন শ্যামবর্ণ, হাস্যমুখ, বলিষ্ঠ সুঠাম দেহ প্রসন্ন চৌধুরী। কত জন প্রণাম করতো, কত জন সেলাম জানাত, সকলের সঙ্গেই তিনি অভিভাষণ বিনিময় করতেন। এত ভক্তি, ভয় ও কৌতূহল তাঁকে জড়িয়ে মন ভরে তুলতো যে ভাল করে দেখতেও সম্ভ্রম হতো।

তারপরে সোনাপদ্মার খাল বেয়ে চলতে সুরু করতো নৌকো। পাটের আড়ত,- গঞ্জ পেছনে রেখে সরুখালের ওপর দিয়ে নৌকো চলত। দুই পাশ থেকে ঘন আম-কাঁঠালের ডাল নৌকার ছই-এ ছপ্ ছপ্ করে লাগতো এসে। তারই ফাঁক দিয়ে শাঁফল্লার রায়েদের নতুন বাড়ী চোখে পড়তো। তারপর সুরু হতো দুই পাশে সুবিস্তীর্ণ ধানক্ষেত। সবুজ ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে শরতের সোনারোদ অকৃপণ অঞ্জলিতে ঢেলে দিতো যে যাদুকর, সেই উথালপাতাল বাতাসে লাগিয়ে দিতো মন-কেমন-করা হু-হু ভাব। গ্রাম যেমন কাছে আসতো তেমনি কানে আসতো সপ্তমীপুজোর ঢাকের শব্দ।

প্রসন্ন চৌধুরীর নাম সেই দিনগুলোর সঙ্গে বড় বেশী জড়ানো।

সে অনেক দিনের কথা! পদ্মার প্রকোপে পুরোন গ্রাম ভেঙে গেল। নতুন গ্রাম পত্তন হলো ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে। লোকজনের বসতির জন্যে ঘর বাঁধবার ব্যস্ততা, রাস্তা বানানো, কূয়ো ও পুকুর খোঁড়া এই সব চলেছে। রাতেও বাতি জ্বেলে কাজ হয়। প্রতিবেশী গ্রাম সিংহাসনের নমঃশূদ্র ও এ গাঁয়ের বাগ্দীদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত করাই ছিল, এ সুযোগে তাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল।

এর মধ্যে একদিন ভরা দুপুরে হৈ-চৈ উঠল চুণেপাড়ায়। মল্ল বা ধীবরজাতির যে সব মানুষ সিংহাসনের বিল থেকে ঝিনুক

কুড়িয়ে পুড়িয়ে চূণ বানায় তারাই চূণে নামে পরিচিত। তাদের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ নলিনী। সে-ই দরবার করতে এল কাছারীতে। —রায় ছ্যান, রায় সাহেব, ব'লে বসল মাটিতে। একমাত্র মেয়ে তার প্রেমদা। স্ব-গাঁয়ের বিপিন চূণের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। সুখ মেয়ের কপালে নেই, তাই স্বামী মরেছে জ্বর হয়ে। বিপিন চূণের কথা সে ধরে না। কে না জানে সে বৌয়ের হাতে চিনির পুতুল—তার বৌ-ই দশ বিঘা ধানী জমি আর ঘরের লোভে প্রেমদাকে কু-প্রস্তাব দিয়েছে। আট বছরে বিয়ে যার, ন' বছরে বিধবা যে, সে কেন ভরা ষোলো বছরে বুকে পাথর দিয়ে থাকবে বাপের ঘরে বাঁদী হয়ে? তার চেয়ে সে মেয়ে আসুক বিপিনেরই ঘরে, বিপিনের আর এক ছেলের হাত ধরে। তাদের সমাজে এ প্রথা অচল নয়। এ প্রস্তাবে দূর দূর করে অসম্মতি জানিয়েছে প্রেমদা। এখন এই কাজের সময়, বিপিনের সেই কাঠগোঁয়ার ছেলে যে প্রেমদার জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে—প্রকাশ্যেই সে শাসিয়ে বেড়াচ্ছে, অন্য ঘর অন্য বর যদি নেয় প্রেমদা, তো সে লাঞ্ছনার অবধি রাখবে না—তার প্রতিকার কি?

প্রতিপক্ষ বিপিনের ছেলে। সে বলল—সে মেয়ের কলঙ্ক রটেছে। এ কথায় তুমুল বিবাদ লাগল। শেষে করজোড়ে দাঁড়াল ভীম। বলল—নলিনের মেয়ের কলঙ্ক রটতোই। চরিত্র তার নিষ্কলঙ্ক, কিন্তু সে মেয়ে রূপেই কলঙ্ক টানে।

প্রসন্ন চৌধুরীর আদেশে প্রেমদা এসে দাঁড়াল। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে জানাল, সে পুনর্বিবাহে অনিচ্ছুক। তার বাবা-মার কাছেই থাকতে চায় সে।

রায় গেল নলিনীর পক্ষে। পরদিন বাপ মেয়েকে নিয়ে এল বড়বাড়ী। নলিনী চূণের রূপসী মেয়ে প্রেমদা, যার রূপ চোখে দেখে বা কানে শুনে গাঁয়ের কত ছেলেরই মন বে-দিশা হয়েছে, তাকে দেখতে ভীড় করে এলেন বড়বাড়ীর ঝি-বৌয়েরা। বাপ

যার চূণের ভাঁটি করে, সেই মালোঘরের মেয়ের অত রূপ থাকতে নেই, তা কি প্রেমদা জানত না? তাই এসেছিল জোলার হাটের বেগুনফুলী কাপড়খানায় সর্বাঙ্গ ঢেকে। চোখের দৃষ্টি ছিল নিচু, পা ফেলেছিল ভয়ে ভয়ে। জমিদারের পায়ের কাছে টাকা নামিয়ে রেখে গড় হয়ে প্রণাম করেছিল প্রেমদা।

তরুণ জমিদারের পায়ে ঘামেভেজা হাতখানা ছুঁইয়ে কপালে ঠেকিয়েছিল প্রেমদা। বাধা দিতে গিয়ে অকারণেই লাল হয়ে উঠেছিলেন প্রসন্ন। প্রেমদার রূপের বাড়াবাড়িটা তাঁর চোখেও লেগেছিল। এক কথায় নলিনী চূণেকে বিদায় দিয়েছিলেন তিনি। কাছারী থেকে আশীর্বাদী কাপড়, নারকেল একখানা ও একটা টাকা নিয়ে যেতে বলেছিলেন। পরদিন ডালায় করে কিছু মাছ এনেছিল প্রেমদা। ছুপুরের পাট মিটতে সূর্য হেলে যায়, অঘ্রাণের বেলা। ঢেঁকি- শালের পাশের পরিষ্কার উঠোনে বাড়ীর অল্পবয়সী মেয়ে-বৌরা প্রেমদার কাছে গান শুনতে চেয়েচিল। বড় নাকি শৌখীন মেয়ে প্রেমদা, অনেক নাকি সে জানে। কি জানে না! তা ছাড়া ভদ্রঘরের মেয়ে-বৌদের কথার ধরন কেমন প্রেমদা তার মধ্যের লুকোন ইঙ্গিত বোঝে না। তবু সে অল্প হেসে চোখ নামিয়ে গান করেছিল। চৌরিঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে সে গান শুনেছিলেন প্রসন্ন।—'জলে ঢেউ দিও না গো রাধা কিশোরী—' ভীরু কম্প কণ্ঠের এই গানে ষোলবছরের গাঁয়ের মেয়ের কত লজ্জা, কত ভয়ই যে কথা কয়েছিল—একবার না তাকিয়ে পারেননি প্রসন্ন। সজ্‌নে গাছের ঝিলমিলে ছায়ায় ডুরেশাড়ী ঈষৎ তুলে পা মেলে বসে গান গাইছিল প্রেমদা, দেখে তাঁর বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠেছিল। তিনি কি জানতেন সে অনুভূতির নাম প্রেম।

ইচ্ছে ছিল বলেই অবকাশ মিলল বার বার সাক্ষাতের। সবই অজানতে, আকস্মিক। ধান কোটতে দাঙ্গা লাগল বাগদী

প্রজাদের মধ্যে। তাই ঠেকিয়ে ফিরতে ফিরতে শ্রান্ত ঘোড়াকে জল খাওয়াতে বিলের ধারে গেলেন প্রসন্ন। ভরা দুপুর। শঙ্খচিলের আর্ত ডাকে মিঠে রোদের আকাশ কেঁপে যায়। কে জানতো সেই সময়ই ক্ষার কাচতে আসবে প্রেমদা সিংহাসনের বিলে?

গ্রামে জল নেই। খাল-বিলই মানুষের ভরসা। ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন প্রসন্ন—ভয় নেই তার? জবাব দিতে পারেনি প্রেমদা। শাড়ীর পাড় আঙুলে টেনে টেনে সমান করে লজ্জায় কথা হারিয়েছিল। সুবিস্তীর্ণ বিল। পাড়ের কাছের অল্পজলে শাপলার ফুল থরথর করে কাঁপে ফড়িংয়ের পায়ের ভরে। মাছরাঙা জল ছুঁয়ে ওড়ে। হৈমন্তিক মধ্যাহ্ন। পাকাধানের গন্ধে বাতাস মন্থর। সে পরিবেশে দাঁড়িয়ে যতটুকু দেখেছিলেন প্রসন্ন, বড় ভালো লেগেছিল। তার পর হাটবারে যেদিন পুরুষেরা হাটে গিয়েছে, সেদিনও অমনি ঘোড়া চড়ে ফিরতে ফিরতে দেখা হয়েছিল নতুন পুকুরের পাড়ে। পুকুর প্রতিষ্ঠা হয়নি, দেবতা-ব্রাহ্মণ জল নেয়নি, নির্জন নিভৃত,—এমন সময় এখানে চূণে মালোর মেয়ে কি করে?

—জল নেয়নি মেয়ে— পুকুরধারে কালমেঘের বন—পাতা তুলে নিয়ে যাবে ঘরে।

পুকুরের উঁচু পাড়। মানুষ-জন দেখতে পায় না। চূণের মেয়ের বড় কাছে এসেছিলেন প্রসন্ন। উত্তেজনায় কণ্ঠস্বর বুঝি পরুষ হয়েছিল। বলেছিলেন— আমার আনাগোনার পথে তুমি হাঁট কেন?

—আর আসব না। —জলভরা সকরুণ চোখ তুলে বলেছিল প্রেমদা। তার পর ত্রস্তে পালিয়ে গিয়েছিল প্রায়। সে কথা ত' বলতে চাইনি প্রেমদা—সে কথা ত' আমি বলিনি—এ কথা বলতে চেয়েও বলতে পারেন নি প্রসন্ন। শিক্ষা, দীক্ষা, জাত ও সংস্কারে বেধেছিল। এ কি দুর্বলতা তাঁর?

তাঁর উন্মনা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব বাড়ীর মানুষ-জন লক্ষ্য করলেও কথা তেমন ওঠেনি। ঘর বাঁধা হচ্ছে, ভিত পুজো চলেছে, রান্না-খাওয়া দেবতা-বিগ্রহের কাজ কোন মতে সুনির্বাহ হয়—গ্রাম পত্তনের কর্ম-মুখর ব্যস্ততার ছোঁয়াচ সকলকেই স্পর্শ করেছে। ধরাবাঁধা অলস মন্থর জীবনের এ একটা ব্যতিক্রম। কে কার দিকে মন দেয়?

মনই বশে নেই প্রসন্নর। প্রেমদাকে মনে আঘাত দিয়েছেন রূঢ় ব্যবহারে, এ কথাই বার বার মনে হয়। পাছে দেখা হয়, তাই সিংহাসন যাবার পথে ঘুরে ঘুরে যান তিনি। সিংহাসনের বিলে জেলেরা শামুক ঝিনুক তোলে— চূণের ভাঁটি করে। ধান-কাটা হয়ে গেছে—শীতের জ্যোৎস্নায় মাঠে দিগ্‌ভ্রম হয়ে যায়। ওদিকে আত্মীয় সমাগমে নতুন বাড়ী মুখর। কালীপুজোর আয়োজন চলেছে, পুকুর প্রতিষ্ঠা করবেন প্রসন্নর পিতামহী। মন মানে না, তাই একদিন গ্রামের কাছেভিতে নয়, বিলের পশ্চিম পাড়ে গেলেন প্রসন্ন। ভেবেছিলেন, নির্জনে এতটুকু বসবেন অথবা এমনিই সেই পথ ভালো লাগতো তাঁর—দেখলেন প্রেমদা উঠে আসছে জল থেকে। পুরোন শাঁখের মতো গৌরবর্ণ সুডৌল মুখের ওপর চোখের চাহনি একটু কাতর, চেহারাতে একটা মলিন ভাব—আজ আর কোন চকিত ভাব নয় এমনিই চলে যাচ্ছিল সে। প্রসন্ন পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বলেছিলেন—এত দূরে তুমি জল নিতে আস?

—এ ত কারো পথ-ভিত নয়। প্রেমদার কথায় বাধা দিয়ে প্রসন্ন বলেছিলেন—কি বলেছি তাই তুমি একেবারে অদেখা হ'লে প্রেমদা? আমি কি তাই বলেছিলাম?

—আমি মূর্খ—কথা জানি না, রীত কানুন জানি না, কখন কি অপরাধ করি—

প্রেমদার কাঁধে হাত রেখেছিলেন প্রসন্ন। বলেছিলেন—তোমার কোন দোষ নেই প্রেমদা।

তা জেনেও আশ্বস্ত হয়নি প্রেমদা। বড় সুকঠোর বিধিনিষেধ গ্রাম-সমাজের। বড় নিদারুণ অপরাধ করেছে তার ষোলবছরের মন। তাছাড়া জমিদার, যাকে রাজা বললেই হয়, তার সাধে সাধ মিশিয়ে এ কি ভুল করল সে? কেমন করে সে বোঝাবে তার ভয় কোথায়? আশে-পাশে কেউ নেই দেখে আরো কাছে এসেছিলেন প্রসন্ন। আবার সস্নেহে বলেছিলেন—তুমি ভয় করো না, আমি তোমার অনিষ্ট করব না।

তখন তাকিয়েছিল প্রেমদা। চোখে চোখে তাকিয়ে আকাশ-বাতাস বিলের জলকে সাক্ষী রেখে নিষ্পাপ প্রেমের স্বাক্ষরস্বরূপ প্রেমদার কপালে হাত বুলিয়ে নিজেই গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন প্রসন্ন। প্রেমদা লজ্জাসরমে মাটিতে মিশে যায় কি না যায়। প্রসন্ন চলে গিয়েছিলেন ঘোড়া ছুটিয়ে।

নিষিদ্ধপ্রেম গানে-গল্পে ঠাঁই পায়। তবু তার পথে অনেক বাধা। জমিদারদের অনুগৃহীতা স্ত্রীলোক, যেমন আরো অনেকে থাকে, তেমন করে যদি গ্রহণ করতেন প্রেমদাকে প্রসন্ন, বাধা দিতো না কেউ। বড়জোর কথা উঠতো—বড়কর্তার ছেলে অনুগ্রহ করেছে নলিনীর মেয়েকে।

প্রেম বলেই অনেক বাধার প্রশ্ন উঠল। বড় গোপনে বেরিয়ে যায় প্রেমদা। প্রসাধনে তার বড় লজ্জা। সিংহাসনের বিলের ধারে বসে গান গাইতে সে লজ্জায় মরে যায়। প্রসন্ন যে যখন তখন বেরিয়ে যান দিনে-দুপুরে, এ নিয়ে অনেক কথা আজ-কাল বড়বাড়ীতে ওঠে। চূণে পাড়া নিষ্ক্রিয় বসে নেই। প্রেমদার বাবাকে প্রকাশ্যেই শোনাল সকলে—বড় গাছে নৌকা বাঁধবার সখ ছিল বলেই না সে এমন উপযুক্ত সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিয়েছিল? শুনে রাগে জ্বলতে জ্বলতে ঘরে ফিরল নলিনী। বলল—তার বিয়ে হবে ঘর সংসার হবে, তুই কোন্ ভরসা করিস? তোকে কি সে পুঁছবে?

প্রসন্নর যে বিয়ে হবেই একদিন, সে ত জানা কথা। তবু কি যে মনে হল প্রেমদার, বড় দুঃখ হল। বাপের কাছে কেঁদে কেটে কথা দিল আর সে যাবে না বিলের ধারে।

স্বজাতে মেয়ের বিয়ে দিল না নলিনী। বড়গাছে নাও বাঁধল। এখন যে ছোটকর্তা বিয়ে করতে বসেছেন, বৌ পেলে কি আর প্রেমদাকে পুঁছবেন? ঘরে বৌ ছিল না, এসেছিলেন প্রেমদার কাছে। মেয়েও কি এমন মূর্খ যে সে যদি মুখ হাসাল ত অন্য দিকে পুষিয়ে নিল না কেন? টাকা, গহনা, ধানীজমি চেয়ে নিল না কেন? এখন কি আর নতুন ক'রে কষ্ট দুঃখ করতে পারবে? নলিনীর বয়স হয়েছে। হঠাৎ যদি মরেই যায় তবে কেমন করে একলা জীবন কাটাবে প্রেমদা? নতুন করে মাছ ধরে, গোবর চাপড়া দিয়ে, বামুন কায়েত বাড়ীর উঠোন ঝাঁট দিয়ে পেট চালাতে ভাল লাগবে তার? এই সব কথা সবিস্তারে প্রেমদাকে শুনিয়ে গেল পাড়ার মানুষ। বিধাতা যাকে বামন করেছে, সে যে চাঁদে হাত দিয়েছিল, তার জন্য অনেকেরই রাগ ছিল মনে মনে। গাঁয়ের পথে চলতে ফিরতে প্রেমদাকে কথা শোনাতে ছাড়ল না কেউ। ভদ্রঘরের মানুষ কেমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা কইতে জানে। খোঁচাটা বিঁধল ঠিক জায়গায়। মরমে মরে গেল প্রেমদা। কেঁদে কেটে নিজের দুঃখে নিজেই সারা হলো। যে মানুষকে নিয়ে এত কথা, তারও ত কই দেখা নেই? তবে বুঝি সব কথাই সত্যি? কেঁদে কেঁদে মলিন হল প্রেমদা। আর সে গ্রামের পথে বেরোয় না। সিংহাসনের বিলের ধারে ক্ষার কাচতে যায় না। বিয়ের কথা ঠিক হ'তে আনন্দ করে যাত্রাপার্টি এনেছে আত্মীয়-স্বজন। সন্ধ্যাবেলা বাজনা বেজে ওঠে। প্রেমদার ঘরে সে বাজনার শব্দ এসে পৌঁছয়। কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে সে সুর। এত সহজেই সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে? মনের কষ্টে প্রেমদা শয্যা নিল প্রায়।

বড়হাটের দিন। সন্ধ্যা হয়েছে। বাবা গিয়েছে হাটে। ফিরতে এখনো কত রাত। ঘরে বাতি জ্বেলে এলো চুলে বসে ছিল প্রেমদা। এমনি সময় এলেন প্রসন্ন।

স্বল্প বাতির আলো। চৌকি পেতে দিল প্রেমদা। এই ক'দিন যে তাকে দেখেননি প্রসন্ন। মুখ কেন আড়াল ক'রে আছে প্রেমদা। পা ধুয়ে দিল, মুছিয়ে দিল। হাত ধরে বসাল চৌকিতে। তারপর বসল পায়ের কাছে। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে মাটিতে।

—তোমার চোখে জল প্রেমদা! তুমি কাঁদছ?

তাঁর হাঁটুতে মাথা রেখে—একেবারে ভেঙে পড়ে দুই পায়ে মুখ রেখে লুটিয়ে পড়ল প্রেমদা।

বুঝলেন প্রসন্ন। বললেন—উঠে বোস প্রেমদা। আমার কথা শোন। কার কথা কে শোনে? নীরবেই কাঁদতে লাগল প্রেমদা। কোন অনুযোগ করল না, প্রশ্ন শুধোল না।

প্রেম ত শুধু দেহের আকর্ষণ নয়, সত্যিকারের প্রেম যে প্রজ্ঞা। মানুষকে অনেক দূর বুঝতে সাহায্য করে। প্রেমদার রুক্ষ চুলে হাত রেখে অনেক কথাই বুঝলেন প্রসন্ন। এই মেয়ে তার নিজ সমাজের ভরসা হারিয়েছে, শুধু তাঁকে ভালোবেসে। আজ সে একান্তভাবে তাঁরই ওপরে নির্ভর করে। তিনি বিয়ে করবেন কি না, সে বিষয়ে সমাজের পাঁচ জনের মত শুনেছেন তিনি। কিন্তু যে তাঁকে ভালোবাসে, তিনি যাকে ভালোবাসেন, তার মতামত ত' নেবার জন্য অপেক্ষা করেননি তিনি? সমাজের জন্য তাঁর স্ত্রী প্রয়োজন। এ তাঁর স্ত্রী হ'তে পারবে না, তাঁর পুত্রের জননী হবে না—কিন্তু দেহ-মনের এমন কি চাহিদা আছে তাঁর যা এর কাছে তৃপ্ত হয়নি? তাঁর হৃদয়-মন ভরে আছে এই মেয়ে। সমাজের শাসনে আর একজনকে এনে তিনি ত' দু'জনের একজনের প্রতিও সুবিচার করতে পারবেন না? আর প্রেমদার জন্ম, শিক্ষা-দীক্ষা যে রকমই হোক, তাঁকে ভালোবেসে সে উন্নত হবার জন্য

প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। সে স্বার্থচিন্তা করেনি, লোভ করেনি— শুধু ভালোবেসেছে তাঁকে, আর তাতেই সে ধন্য বোধ করেছে।

এতখানি তাঁকে আর কোন্ মেয়ে দেবে? বুঝলেন ব'লেই সঙ্কল্প নেওয়া সহজ হ'ল তাঁর পক্ষে। সকরুণ স্নেহে বললেন— ওঠ। ওঠ—চোখ মোছ, আমার কথা শোন। কি হয়েছে? আমি বিয়ে করছি তাই শুনেছ? কার কাছে কি শুনেছ প্রেমদা? আমার কাছে ত শোননি? এবার শোন আমি বলি। তোমার কাছে ত আমি মিথ্যে বলব না প্রেমদা।

প্রেমদা অবাধ্য নয়। মাথা তুলল। চোখ-মুখ মুছল। প্রসন্ন ধীরে ধীরে বললেন—শোন প্রেমদা! আমি যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হই, আমার অন্তরাত্মা থেকে বলছি, বিশ্বাস কর, আমি কথা দিচ্ছি আমি বিবাহ করব না। আমি ভুল করেছিলাম।

এ কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা! পিতৃকৃত্যের পর মুণ্ডিত মস্তক, সুন্দর কান্তি, দীর্ঘ সবলকায় প্রসন্নর মুখে এক অপূর্ব ভাব প্রতিভাত হয়। কঠোর সংকল্প গ্রহণের এক পবিত্র আনন্দ ফুটে ওঠে মুখে। প্রেমদার মনে হয় মানুষ নয়, যেন কোনো দেবতার মতোই দেখাচ্ছে প্রসন্নকে। তেমনই পবিত্র, তেমনি সর্বশক্তিমান। প্রসন্ন বলেন—তুমি নিশ্চিন্ত হও প্রেমদা।

—এত বড় ত্যাগ তুমি আমার জন্য কোর না ছোটকর্তা! তুমি সংসারী হও। তোমার রাজার সংসার ভরে উঠুক। আমি চোখ ভ'রে দেখব ছোটকর্তা! শুধু আজ যেমন, সেদিন-ও তেমনই পায়ে ঠাঁই দিও।

—না প্রেমদা! বার বার কথা আমি বদলাই না।

—এ কি করলে তুমি ছোটকর্তা!

—এর জন্যে অনেক কথা আমায় শুনতে হবে প্রেমদা। তুমি আর বোল না।

—আমি যে অনুতাপে মরে গেলাম।

—শুধু এই মনে রেখো প্রেমদা, তুমি কোন দিন ঘা দিও না।

—এ কি হ'ল ছোটকর্তা।

—সংসারে কি সব হয় প্রেমদা !

তখন নতুন করে কৃতজ্ঞতায় প্রসন্নর পায়ে মাথা রেখে কাঁদল প্রেমদা। বলল—তুমি বিশ্বাস করো, আমি এত চাইনি। আমি মহাপাতকী ছোটকর্তা, তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমি ত' আর কিছু জানি না, শুধু তোমাকে জানি। আমাকে শুধু মুখে একবার বলতে, তাতে-ই হতো। আমার মতো অভাগিনীর জন্য এত বড় প্রতিজ্ঞাটা করলে তুমি ?

আষাঢ়ের আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামল। বাতির আলো কেঁপে উঠল বাতাসে। প্রসন্নর মন থেকে জাতিধর্মের কথাটা কোথায় হারিয়ে গেল। তিনি পুরুষ, আর প্রেমদা নারী, এ ছাড়া অন্য কথা মনে রইল না তাঁর।

পরদিন প্রভাতে, সর্বজন সমক্ষে প্রসন্ন জানালেন—তিনি বিবাহ করবেন না।

ইতিমধ্যেই উৎসবের সুর লেগেছে। পল্লীগ্রামে সব উপকরণ মেলে না, তাই লোক চলে গিয়েছে পাবনা। কন্যার পিতার সঙ্গে কথাবার্তা এক রকম স্থির। শ্রাবণে পড়েছে শুভদিন। চার দিন বাদেই পাত্রপক্ষ যাত্রা করবে। এখন এ কি অসম্ভব প্রস্তাব !

প্রসন্ন কোন যুক্তি মানলেন না। বললেন, বংশরক্ষার জন্য বিবাহের প্রয়োজন, আমার সে প্রয়োজন নেই। সন্তান প্রতিপালিত হচ্ছে তার মাতামহীর কাছে, কাজেই তাকে দেখবার জন্য বিয়ে করবার কোন মানে হয় না। আর অন্যান্য কর্তব্য ? তার জন্যে সংসারে আরও ঝি, বউ, পিসিমা রয়েছেন। তাঁরা থাকতে নতুন করে এ সংসারে একজন নাবালিকাকে আনবার কোন প্রয়োজন নেই।

দৃঢ় সংকল্প প্রসন্নর। কথা তিনি বেশী বলেন না। আর যদি বলেন তো একবারই বলেন। সে কথা নড়চড় হবার নয়।

কারণ অনুসন্ধান করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠল মানুষ। বেশী দূর যেতে হলো না। যা ছিল গোপনে, পরস্পরের মধ্যে, এক মুহূর্তে তা প্রকাশিত হলো। কথা উঠল দু'দিক থেকেই। ন্যায়ধর্মের ধ্বজাবাহী তর্কালঙ্কার, ব্রাহ্মণ সমাজের অন্যান্য মাথা যাঁরা—তাঁরা প্রকাশ্যেই জানালেন, প্রসন্নর বিচ্যুতি ঘটেছে। মাল্লো-সমাজ বলল, যে রক্ষক, সে-ই যদি ভক্ষক হলো—তবে স্ব-জাতের বিপিন চূণের ছেলে কি অপরাধ করেছিল?

কারও কথায় কান দেননি প্রসন্ন। জমিদার হিসেবে তাঁর যা কর্তব্য, তিনি করে চললেন অবিচলিত ভাবে। গ্রাম্য-সমাজে প্রবলের ওপর প্রতিশোধ নেবার যে-সব চোরা উপায় আছে, তাঁর ক্ষেত্রেও তার ব্যবহার হলো। রক্ষণাবেক্ষণের কাজে তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। সেদিকে বাধা দিল না কেউ। তবে ব্রতপূজা, আচার অনুষ্ঠানে তাঁর যে প্রথম স্থান ছিল, সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে মনে হলো। এক দিন কথা উঠল। বল্লালসেনের বার্ধক্যে হড্ডিকাযোগ ঘটেছিলো। হাড়ীর মেয়েকে ভালবেসে তিনি স্বেচ্ছায় রাজ্যপাট লক্ষ্মণসেনের হাতে তুলে নির্বাসনে গিয়েছিলেন; এই কিংবদন্তী বলে হাসাহাসি করলেন সভাস্থ ব্রাহ্মণরা। প্রসন্নর অনুপস্থিতিতে ব্যাপারটা ঘটলো। কিন্তু কথা কানে পৌঁছতে দেরী হলো না। ব্যক্তির চাইতে সমাজ বড়। পরদিন থেকে প্রসন্ন আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ গ্রহণে বিমুখ হলেন। সমাজ তাঁকে ত্যাগ করবার আগেই তিনি সমাজকে এড়িয়ে গেলেন।

ভেতরে ভেতরে তাঁর যে আঘাত লেগেছিল, তা জানল একমাত্র প্রেমদা। প্রেমদার সাজানো সুন্দর ঘরখানিতে বসলে সমস্ত মন-প্রাণ তাঁর জুড়িয়ে যায়। জ্যোৎস্নাপুলকিত নিশীথে জল-চৌকির ওপর মুখোমুখি বসে প্রসন্ন প্রেমদাকে বলেন, তোমার

কাছে এলে বড় শান্তি পাই প্রেমদা। বলেন—তুমি যদি না থাকতে তবে এই সময় কি করতাম আমি প্রেমদা!

প্রেমদা বলে, আমি নেই, তুমি আছ একা এই সংসারে —একথা আমি ভাবতে পারি না।

সে বার আশ্বিনের ঝড়ে অনেক নৌকাডুবি হয়। পাবনা থেকে পুজোর বাজার করে আসছেন প্রসন্ন, মাঝপথে ঝড় উঠল। দুটো দিন কোন খবর নেই, পাগলের মতো ঘর-বার করছিল প্রেমদা। সোনাপদ্মার খালের বাঁকে উৎসুক জনতার এক পাশে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রোদনস্ফীত নয়নে দেখছিল নৌকো আসে কি না আসে। ঘরে ফিরে কেঁদে কেটে উপবাসে থেকে প্রেমদা যখন দিশাহারা, তখন হাসতে হাসতে এলেন প্রসন্ন। বললেন—এত ব্যস্ত হয়েছিলে কেন? দেখ এখনো আমি পথের কাপড় ছাড়ি নি।

তার গা দিয়ে একখানা নতুন কাপড় খুলে ছড়িয়ে দিলেন প্রসন্ন। বললেন—পরে এসো।

কালো ঢাকাই শাড়ী, মাঝখানে রূপোলী জরীর ফুল। এমন একখানা কাপড় ত' প্রেমদার স্বপ্নেও ছিল না। প্রসন্নর অনুরোধে পরে এল তবু। জমকালো আঁচলখানায় মাথা ঢেকে প্রণাম করতে নিচু হচ্ছিল প্রেমদা, হাত ধরে তুললেন। একটু হেসেই বললেন—এমনটি আর কাউকে মানাবে না। ব'লে চেয়ে চেয়ে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কি কথা যে মনে এল, বললেন না কিছু।

পরে একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন—কি জান, যাকে এত ভালবাসা যায়, তাকে তুমি মনের মতন করে পাবে না—এ বড় আশ্চর্য বিধান প্রেমদা!

প্রেমদা বলেছিল—ছোটকর্তা, তোমার কথা শুনলে বুকের ভেতরটা জ্বলে যায়। কি পাপ করে এসেছিলাম বল, তোমাকে

একদিন সেবা করতে পারব না—এ যে আমার কি দুঃখ!

—সত্যি, প্রেমদা?

—সত্যি। তবে কি করবো বলো। এ জন্মে এমনিই যাবে। তার কথা শুনে বড় দুঃখ হয়েছিল প্রসন্নর। প্রেমদা তখন বলেছিল—এই দেখ, আবার তোমার মনে দুঃখ দিলাম। আমার কপালে ধিক্কার ছোটকর্তা, ও কথা তুমি ভুলে যাও।

—তোমার এ দুঃখ যে আমি দূর করতে পারি না প্রেমদা। আমার হাত-পা বাঁধা। তুমি একটা কিছু চাও প্রেমদা। বল কি দিতে পারি।

তখন কি মনে করে হেসেছিল প্রেমদা। বলেছিল—একটা জিনিস চাইব, দেবে? এই পায়ে হাত রাখলাম। পা ছুঁয়ে আছি, বল?

—দেব।

একটা কথা—

—বল।

ধীরে ধীরে প্রেমদা বলে—দেখ, আমার ত' কোন দুঃখ তুমি রাখনি। কিন্তু আমার সমাজের এই মেয়েরা—চোত-বোশেখে তারা আজও সেই সিংহাসনের বিলে জল সরতে যায়। রাস্তা করে দিয়েছ, হাসপাতাল করে দিয়েছ, পোষ্টাফিস, কোন দুঃখ তুমি রাখনি। এদিকে বুড়োশিবের দীঘিটা হেজে মজে রয়েছে, ওটা তুমি সারিয়ে দাও, মানুষ চিরদিন তোমার নাম করবে। আমার কূয়ো থেকে ওরা সবাই জল নিয়ে যায়। বল, তাতে কি এত বড় মালোপাড়ার জলকষ্ট যায়?

শুনে বড় আনন্দিত হলেন প্রসন্ন। সেই বছরই বুড়োশিবের দীঘি সংস্কার করালেন। চৈত্র-বৈশাখে বিশাল দীঘিতে টলটলে জলে স্নান করে, ঘরে নিয়ে শুধু মালোরা নয়, জোলা, বাগদী সবাই বেঁচে গেল। প্রসন্নকে সবাই ধন্য ধন্য করল। প্রসন্ন

বললেন—ওরা ত জানে না, এর পেছনে আসল মানুষ কে, তাই আমার নামই করছে।

প্রেমদা বলল—যত দিন দীঘিতে জল থাকবে, মানুষ তোমার নাম করবে, সে কত ভাল হ'ল বল তো ?

মাঝে মাঝে প্রেমদার অনেক কথাই মনে হ'ত। একদিন বলেছিল—আচ্ছা পরজন্ম, জন্মান্তরে ফিরে আসা, এ সব সত্যি হয় ?

—নিশ্চয় হয়।

—কিন্তু যে যা চায়, তা ত পায় না।

—অনেক চাইতে নেই প্রেমদা। আর যদি সত্যি ভক্তি ভরে চাও, ত নিশ্চয় পাবে।

তখন প্রসন্নর পায়ে হাত রেখে প্রেমদা বলেছিল—ছোটকর্তা, তোমার, খোকাবাবুর, সকলের জন্যে ভগবানের কাছে আমি কত প্রার্থনা করি যদি আমার মনে 'কু' না থাকে, তাহ'লে নিশ্চয় আমি পরজন্মে বামুন ঘরে জন্মাব।

সারাদিন কাছারীর কাজকর্ম করেন। সন্ধ্যায় প্রসন্ন গিয়ে বসেন প্রেমদার কাছে। সামান্য একটি জেলের মেয়ের অন্তরে যে এত ঐশ্বর্য থাকতে পারে, যা তাঁর কাঙাল মনকে ভরে দেয় অথচ নিজে ফুরিয়ে যায় না—এই বিস্ময়ই তাঁকে ভরে রেখেছে। প্রেমদার মুখের দিকে চেয়ে সেই ত্রিশ বছর আগেকার হাস্যমুখী ষোড়শী তরুণীকে ছাড়া আর কাউকে দেখেন না প্রসন্ন। এই এক প্রেম তাঁকে এমন পূর্ণ করে রেখেছে যে আর কি পেলেন না পেলেন, সব ফাঁকিই তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে তাঁর কাছে। সমাজ নেই, সংসার নেই, আছে শুধু প্রেমদা।

আবার এক অঘ্রাণ এসেছে। পাকাধান বোঝাই করে পথ দিয়ে গরুর গাড়ী চলেছে সন্ধ্যায়। পরিপূর্ণ একটা প্রশান্তির

ভাব চরাচরে ব্যাপ্ত। প্রসন্নর পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে প্রেমদা বলল—ছোটকর্তা!

—বল।

—দেখ, পরকালের কথা ত' এতকাল কিছু ভাবলাম না। এখন মনে হয়, যদি একদিন অষ্টপ্রহর নাম-কীর্তন দিতে পারতাম মনটা জুড়োত।

উঠে বসলেন প্রসন্ন। ঈষৎ হাসি চোখে নিয়ে তাকিয়ে রইলেন। বললেন—দেখ প্রেমদা, ইহকাল পরকাল যা বল আমার চোখে তুমিই সব। আমি মনেপ্রাণে জানি আমি পাপ করিনি, প্রায়শ্চিত্ত করবার কথা আমি ভাবি না। তবে তুমি যদি শান্তি পাও, তো হোক নাম-গান। সিংহাসন থেকে ডেকে পাঠাই কামিনী বাসিনীকে। নরোত্তমের আখড়া থেকে লোক আসুক।

অষ্টপ্রহর নাম-সংকীর্তনের খবর পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল গ্রাম-সমাজ। কিন্তু সংকীর্তনের স্থান হচ্ছে মালোপাড়া। প্রেমদা হচ্ছে তার প্রধান কর্মকর্ত্রী, এ কথা জেনে ক্ষোভের সীমা রইল না কারও। নতুন করে তাঁরা খেদ করলেন—জাতধর্ম রসাতলে গেল। অনাচার, ঘোর অনাচার করলেন প্রসন্ন। এই কালাপাহাড়ী-কাজের জন্য যে তাঁকে অনুশোচনা করতে হবে, সে কথা বলতে কেউ বাকি রাখলেন না।

দৃক্‌পাতহীন প্রসন্ন। বিশাল সামিয়ানা খাটিয়ে কীর্তনের ব্যবস্থা হলো। মাটি খুঁড়ে বড় বড় উনোন কেটে রান্নার ব্যবস্থা করলো মালোপাড়ার মাতব্বররা। আশ-পাশের গ্রাম থেকে মানুষ এল ভিড় ক'রে। কৈবর্ত, বাগদী ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেতর জাতির মানুষ গরুর গাড়ী চড়ে, পায়ে হেঁটে ভাগ নিতে এল এই মহোৎসবে। ধূপধূনোর গন্ধে আমোদিত অঙ্গনে যখন সু-স্বরে বোল তুললেন কীর্তনীয়া, রসিক খোলন্দাজ খোলে চাঁটি মেরে

জাঁকিয়ে তুলল গান—তখন প্রেমদার আনন্দের সীমা রইল না। প্রসন্নকে বারবার বলল—মহা সুখী আমি। জন্ম আমার সার্থক হলো।

প্রসন্ন নিজে দেখা-শুনা করেন দাঁড়িয়ে থেকে। দিনে তিন-চার বার যাওয়া-আসা করেন। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। তাঁর সমাজের মানুষদের তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষা দেখেও দেখেন না তিনি। এমনি করে ঠাণ্ডা লাগল। অসুস্থ হয়ে পড়েন প্রসন্ন। ডাক্তার দেখে বলল নিউমোনিয়া। অসুখের বাঁকা গতি দেখে ওষুধ আনতে লোক গেল পাবনা। ঢাকাতে এম.এ. পড়ছে সোমনাথ মামাবাড়ীতে থেকে। তাকে তার ক'রে দেওয়া হলো সত্বর আসবার জন্যে। ছোটকর্তার জীবনের আশঙ্কা, এ খবর ছড়িয়ে পড়লো। একে একে আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী সবাই এসে ভিড় করলেন বাড়ীতে। কেউ জোরে কথা বলেন না। ফিস্-ফিস্ করে আলোচনা চলে। হঠাৎ একটা অশুভ ছায়া নেমেছে।

খবর পেয়ে প্রেমদার দুশ্চিন্তার অবধি নেই। এলেন না যখন ছোটকর্তা, তখন লোক পাঠিয়ে জানল তাঁর গুরুতর অসুখ হয়েছে। শুনে অবধি উদ্বেগের সীমা নেই প্রেমদার। নিজে যেতে পারে না, মানুষের হাতে-পায়ে ধরে এতটুকু খবরের জন্যে।

সোমনাথ এসে পড়লো। ডাক্তার কোন ভরসাই দিতে পারলেন না তাকে। বললেন—নেহাৎ লোহার মতো কাঠামোটা ছিল, তাই এত যুঝতে পারছেন। এখন শুধু ক'টা দিনের ব্যাপার মাত্র। অন্য কাঠামো হলে এত দিনে—

এগারো দিনের দিন সন্ধ্যাবেলা, যখন অবস্থা খুবই খারাপ, মনে হলো কিছু বলতে চাইছেন প্রসন্ন। সোমনাথ ঝুঁকে পড়ল। বলল—বাবা কিছু বলবেন? প্রসন্ন ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—আমার একটা ইচ্ছা আছে।

কি সে ইচ্ছা? মৃত্যুপথযাত্রী পিতার সব ইচ্ছাই পূরণ করতে

চায় সোমনাথ। প্রসন্ন বলেন, প্রেমদাকে তুমি ডেকে আন। আমি জানি, সে ব্যস্ত হয়ে আছে। সে না এলে আমি যেতে পারি না সোমনাথ।

বজ্র পড়লেও এতখানি বিস্মিত হতো না মানুষ। তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্রসন্ন চৌধুরীর মৃত্যুশয্যায় আসবে জেলের মেয়ে প্রেমদা? সোমনাথ বুঝল। বলল—আমি নিজে যাচ্ছি বাবা।

ঘর থেকে সরে গেল মানুষ। দেবতা ব্রাহ্মণ সমাজ সংস্কারকে রসাতলে দিয়ে কেমন নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করছেন প্রসন্ন চৌধুরী সেই অজাতের মেয়েটার জন্য। তা-ই দেখতে লাগলো তারা দুই চোখ বিস্ফারিত করে।

লোকের মনের অভিশাপের যদি শক্তি থাকতো, তবে সেদিন আকাশ ভেঙ্গে পড়তো প্রেমদার মাথায়। কিন্তু তা হ'লো না। ঋজু ভঙ্গীতে, মাথা উঁচু করে কোন দিকে না তাকিয়ে সোমনাথের পেছন পেছন এলো প্রেমদা ছুটতে ছুটতে। ঘর থেকে কারুকে সরে যেতে বলতে হলো না। আগেই সরে গিয়েছে মানুষ।

শূন্যঘরে বাতি জ্বলছে। প্রেমদা ঢুকেই নতজানু হয়ে বসলো মাটিতে। প্রসন্নর পাশে। প্রেমদার দিকে চাইলেন প্রসন্ন।

সব চুপচাপ। তার কিছুক্ষণ বাদেই বেরিয়ে এল প্রেমদা। চোখে জল নেই। কণ্ঠে নেই কান্না। কারো দিকে তাকাল না সে—সোজা দেউড়ী পেরিয়ে নেমে গিয়ে চলে গেল ধানক্ষেত পেরিয়ে সিংহাসনের বিলের দিকে।

অঘ্রাণের আবছা কুয়াশায় তাকে যতক্ষণ দেখা গেল, চেয়ে রইল সোমনাথ। বুঝতে তার বাকি রইল না—প্রায়শ্চিত্তের বিধান নিয়ে ঘৃত চন্দনকাষ্ঠে ধূমধাম করে যার শেষকৃত্য করতে দিয়ে গেল প্রেমদা, সে শুধু শবদেহ মাত্র। প্রসন্ন চৌধুরীকে সে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল সকলের চোখের ওপর দিয়ে—ঐ সিংহাসনের বিলের ধারে। আর কোন দিন তাদের বিচ্ছেদ হবে না।

চম্পা

১৮৫৭ সাল। কানপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট।

ল্যাংড়া কোতোয়ালি পিওন হরচান্দ্ সিং কানপুর রেজিমেণ্টে সকলের চেনা। বুড়ো গাড়োয়ালি। ভুরু অবধি সাদা। কাঠামোখানা শক্ত বলে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। ১৮৩৭ সালে হুইলার সাহেবের ঘোড়াকে ছুট করাতে গিয়ে উলটে পড়ে একখানা পা জখম হয়ে যায় হরচান্দের। হুইলার সাহেবের দয়াতে মাসে দুই টাকা মিলছে তার আজও। বিশবছর বাদেও সামরিক দপ্তর থেকে। তাতে পেট চলবার কথা নয়। তাই হরচান্দ্ রেজিমেণ্টের রিসালাবাজারে একখানা ঘর ভাড়া করে শাকসবজি বেচবার পারমিট নিয়েছে। তার পাশে বসে থাকে তার বাইশ বছরের নাতজামাই ব্রিজলাল। মা বাপ মরা নাতনি চম্পার সঙ্গে ব্রিজলালকে বিয়ে দিয়ে সংসারে বাঁধন জড়িয়েছে হরচান্দ্। বড়ো ভালো মেয়ে চম্পা। বড়ো ভালোবাসেন তাকে ক্যাণ্টনমেণ্টের মেমসাহেবরা। বিশেষত শেরিডান সাহেবের বিবি তো চম্পাকে ছোটবেলা থেকেই স্নেহ করেন। বাইবেলের ছবি দিয়ে, চুল বাঁধতে শিখিয়ে, সেলাই শিখিয়ে নানাভাবে চম্পার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন মেমসাহেব। হিন্দু বিয়ের রীতিনীতি আলাদা। ইচ্ছে থাকলেও এই বিয়েতে কেক বানাবার সুযোগ ছিল না। তাই অনেক আশীর্বাদ জানিয়ে একটি লাল থলিতে দশটি টাকা দিয়েছিলেন মেমসাহেব চম্পাকে। চম্পার কানের গহনা সেই টাকাতেই কেনা। চম্পা আর ব্রিজলালকে নিয়ে সুখে থাকে হরচান্দ্। কেউ জিজ্ঞাসা করে যখন—কেমন আছ? কি খবর?

কোম্পানিকী দয়া মেঁ······বলে কথা শুরু করে হরচান্দ্। সকলেই কৌতুক অনুভব করে হাসে। সবাই জানে কথা শুরু করতে হলেই হরচান্দ্ বলবে—কোম্পানিকী দয়া মেঁ···। একদিন হুইলার সাহেবকেও পথে সেলাম দিয়েছিল হরচান্দ্। হুইলার বলেছিলেন—তবিয়তের কি হাল হরচান্দ্?

কোম্পানিকী দয়া মেঁ······ হরচান্দের জবাব শুনে খুব কৌতুক অনুভব করেছিলেন হুইলার। সেই থেকে হরচান্দ্ আরো বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। কোম্পানিকী দয়া মেঁ ······তার মুখে এই কথাটা শুনবে বলেই লোকজন তাকে বারবার জিজ্ঞাসা করে—কেমন আছ হরচান্দ্? তবিয়তের কি হাল? হাসতে হাসতে হরচান্দ্ বলে—কোম্পানিকী দয়া মেঁ···

দোকানে বসে প্রভুলালের সঙ্গে দাবা খেলছে হরচান্দ্ আর আলু তৌল করছে ব্রিজলাল, এমন সময় চুড়ি বাজাতে বাজাতে দোকানে ঢুকল চম্পা। রাস্তা থেকে উঠে আসতে ব্রিজলালকে যেন দেখেও দেখল না। আহ্লাদ করে ফরসা কাপড় পরেই দাদার কাছে বসে পড়ল মাটিতে। বলল—দেখ দাদা, মেমসাহেব কি দিল আমায়।

মোরাদাবাদের পেতলের জালিকাজ করা কাস্কেট। তাতে থরে থরে সুচ, নানা রঙের সুতো, বোতাম সাজানো। হরচান্দ্ বলল—দেশে চলে যাবে মেমসাহেব। তার কাছ থেকে এটা কি জিনিস নিলি চম্পা? দামী কিছু নিলি না কেন?

—এটাও দেখ।

রূপোর চেনে ছোট্ট একটা লকেট। দিল্লীর রেজিমেণ্টের চ্যারিটি ফেয়ার পরিচালনায় পারদর্শিতার জন্য ক্লাবের তরফ থেকে মার্গারেট শেরিডানকে দেওয়া উপহার। চম্পা বলল—মেমসাহেব বললেন, চম্পা, কি চাস তুই বল? আমি বললাম, এমন একটা কিছু দিন, যাতে আমার সর্বদা আপনাকে মনে পড়ে আর সকলকে

দেখাতে পারি। মেমসাহেব বললেন, এটা তাঁর অল্পবয়সের মেডেল। কখন-ও পরেন নি গলায়। যত্নের জিনিস, তাই এটাই দিলেন।

—কি করবি ?

গলায় পরব—বলে ঘরে উঠে গেল চম্পা। ব্রিজলালকে চোখ টিপে ইশারা করল। করুণ চোখে দাদাশ্বশুরের দিকে তাকাল ব্রিজলাল। একহাত কাঁচের চুড়ি আর পেতলের চাবির গোছা ঝনঝনিয়ে রাগ জানিয়ে গেল চম্পা। ব্রিজলাল দেয়ালের গায়ে কুলুঙ্গীতে গণেশ-মূর্তির দিকে তাকাল। তার বিপদের কথা সে-ই জানে। এদিকে খদ্দের দোকানে,—দাদাশ্বশুর দাবা খেলছে, বৌ হয়তো রাগ করল। সবদিক কি ঠেকা দেওয়া যায় ? সুজনকে আদা দিয়ে পয়সা নিতে নিতে মনে মনে তারিফ করল ব্রিজ। এই কালো, রোগা, বাতিক আর বাতগ্রস্ত লোকটা কি অসীম দক্ষতার সঙ্গে দুটো দজ্জাল বৌ আর দুই প্রস্থ শ্বশুরবাড়ি সামলে যাচ্ছে সাত বছর ধরে। পয়সা দিতে দিতে বলল—বাহাদুর! সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল সুজন। ব্রিজের ওপর তার অনাস্থা অসীম। চারপাশে এতগুলো মামুলি চেহারা থাকতে এই রকম লম্বা-চওড়া গোঁফওয়ালা একটা বর্বরকে কেন যে নাতনি দিল হরচান্দ্ কে জানে। লাভের মধ্যে কুয়োতলায় বসে বাসন মাজতে মাজতে রামসহায় মিশিরের গলির সব মেয়েরাই বলাবলি করে, বর চাই বিরিজের মতো, অমনি গোঁফ না থাকলে পুরুষের শোভা হয় না।

পেতলের সানকিতে আটা ঢেলে জল ছিটিয়ে বেগুন কুটল চম্পা। চুলো জ্বালিয়ে ডাল চাপিয়ে দিল। পরিষ্কার ঠাণ্ডা আঁধার ঘরখানা আবার ঝাড়ু দিল। তারপর যত্ন করে মেম-সাহেবের দেওয়া মালাটা টাঙিয়ে রাখল দেয়ালে। এ কি রকম মালা ? কোনো কারুকাজ নেই, কি সব লেখা। এ মালা সে কোনোদিনই পরবে না।

শেষ অবধি অবিশ্যি শেরিডান সাহেবের দেশে যাওয়া হল না। বাজার গরম করে নানারকম কানাঘুষো শোনা গেল। রেজিমেণ্ট-বাজারে গুজবের যেন পাখা গজিয়েছে। ফৌজ আর রিসালার মধ্যে কানাকানি চলতে লাগল। তাই নিয়ে জটলা হতে লাগল হরচান্দের ছোট্ট দোকানে। এই গোলমালের মধ্যেই শেরিডান সাহেব ঘোড়া থেকে পড়ে পা ভাঙলেন। বুড়ো ডাক্তার ম্যাকলে মাথা নাড়লেন। মিসেস শেরিডানের বিয়ের উপহারের রুপোর পেয়ালায় কফি খেতে খেতে বললেন—জায়গা বদলানো চলবে না। ডাকের গাড়িতে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

মে মাসের প্রথম দিক। গরম পড়ছে। ছোট্ট পাঙ্খাকুলিটা ঘুমিয়ে পড়েছে। ধুলোর ঘূর্ণি পাকিয়ে উঠছে বাতাসে। গঙ্গার ওপার থেকে খেয়া মাঝির গলার ডাকটা কেমন উদাস করে দিচ্ছে মন। সেইদিকে তাকিয়ে মিসেস শেরিডানের হাতটা টেনে নিলেন শেরিডান। বললেন—ইণ্ডিয়াতে পঞ্চাশটা বছরই কাটিয়ে দিলাম, কি হবে ছুটির কথা ভেবে। এখানেই থাকি, কি বল মার্গারেট? মার্গারেট স্বামীর হাতে মৃদু চাপ দিলেন। বৈশাখের সকালের এই মন উদাস করা ধূ ধূ পরিবেশে মনটা শান্ত হয়ে এল। মনে হল কি হবে আর নতুন করে ঝামেলা করে। এই তো বেশ আছি। ছেলে-মেয়ে নেই, আছে একমাত্র শেরিডানের ছোট ভাইয়ের ছেলে এভারেট। সেও আগ্রাতেই রয়েছে। বললেন—তাহলে মিসেস ড্যানিয়েল্‌সকে লিখে দিই, কি বলো? অরফান স্কুলটার জন্যে চ্যারিটি যদি কিছু করা যায়।

সেই মালাটার কথা সবাই ভুলে গেল। ব্রিজ চম্পাকে বলল—ও কি গলায় পরে? তোকে আমি সোনার হার দিচ্ছি, সবুর কর। চম্পা স্বামীর হাত গলায় জড়িয়ে নিয়ে বলল—বা রে, আমি কি গয়না চেয়েছি? টাকা হলে সবচেয়ে আগে দাদাকে

একবার কাশী ঘুরিয়ে আনতে হবে। কথা দেওয়া আছে, মনে নেই ?

ব্রিজ বলল—নাতনি ভাবে দাদার কথা, দাদা ভাবে নাতনির কথা, আমার কথা কে ভাববে বল্। বিয়ের আগে কি এত জানতাম ?

—জানলে বুঝি বিয়ে করতে না ?

এই সব কথাবার্তার ভেতর দিয়ে মালাটার প্রসঙ্গ সবাই ভুলেই গেল। দেওয়ালে তেমনিই টাঙানো রইল মালাটা। মেমসাহেবের সঙ্গে আর একবার দেখা করবে ভাবল চম্পা। সংসারের নানা কাজে সময় পেল না। যাই যাই করেও যাওয়া হল না। আর গরমও পড়ল প্রচণ্ড। ভরা বৈশাখ। মাটি যেন জ্বলে যাচ্ছে, গঙ্গার জল শুকিয়ে যাচ্ছে। নৌকো চলাই কঠিন হয়ে উঠবে মনে হয়।

সেই প্রভাতের প্রশান্তি ভেঙেচুরে ঘনিয়ে নামল কালবৈশাখী। মীরাট ছাউনিতে তুফান উঠল। ১০ই মে। ঝাপটায় টালমাটাল হয়ে গেল কানপুর। বিজিত ও বিজেতা, দুই জাতের মোকাবিলার সময়ে দিনগুলো হয়ে গেল রক্তাক্ত। কানপুরে খুন হয়ে গেল ইংরেজ নরনারী ও শিশু। গঙ্গায় জল ছিল না। নৌকোয় চড়ে পালাবার চেষ্টা মর্মান্তিকভাবে বিফল হল। সতীচৌড়া ঘাটের জল লাল হয়ে গেল। বিবিঘরে ইংরেজ নারী আর শিশুরা হলো নিহত। তার জবাব নিতে এগিয়ে এল হ্যাভলকের বিজয়ী ফৌজ। কানপুরের যে সব ভারতীয় নাগরিক ইংরেজ হত্যায় কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নি, তারা ছাড়া সকলেই পালিয়ে গেল শহর ছেড়ে। রইল তারাই, যারা খুব ভালো করে জানে যে তারা নিরাপদ।

আজ তারিখ কত ? ১৩ই জুলাই ১৮৫৭। হরচান্দের ঘরে বিছানায় শুয়ে পাশের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে এভারেট শেরিডান

আবার মনে মনে উচ্চারণ করল তারিখটা। দুরন্ত গরম। হ্যাভলকের ফৌজের সঙ্গে আসতে আসতে ফতেগড়ে একটা ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়ে গেল। হতভাগ্য এভারেট। নিহত নারী ও শিশুদের হয়ে প্রতিশোধ নিতে প্রতিশ্রুত প্রত্যেকটি ইংরেজ সৈনিক। যাদের আত্মীয়-স্বজনরা নিহত হয়েছে তাদের মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। কাকা আর কাকিমার মৃত্যু-সংবাদ এভারেট বিশ্বাস করতে পারে নি। কিন্তু সংশয়ের কোনো অবকাশই নেই। বৃদ্ধ শেরিডান নিহত হয়েছেন সতীচৌড়া ঘাটে। তার কাকিমা? বালিশে মুখ গুঁজল এভারেট। তার কাকিমা কাছে থাকলে কি বলতেন? সাহস রাখো, ধৈর্য ধর? ভালোই হয়েছে। এই চরম বেইমানির দিনগুলো দেখছেন না তাঁরা। ঈশ্বরের প্রত্যেকটি সন্তানকে ভালোবাসবার ও ক্ষমা করবার নীতিটা একমাসেই বরবাদ হয়ে গিয়েছে। জানের বদলে জান, তরোয়ালের বদলে গুলি, এই হচ্ছে নতুন নীতি। বড় দুঃখের কথা, এই সময়ই এভারেট চোট খেল পায়ে। পথে এই বাড়ীটা ছিল তাই ডুলির জন্যে অপেক্ষা করছে সে। কিন্তু নেটিভের বাড়ী?

দুধের লোটা নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকল হরচান্দ্। বলল —এ চম্পা, এ দিকে আয়। দুধ গরম করে দে সাহেবকে।

করজোড়ে বলল—সাহেব, একটু দুধ খাও। বড় তকলিফ করে এনেছি। কোম্পানিকী দয়া মেঁ······

ঘোমটা টেনে মুখ ঢেকে দুধের গ্লাস নিয়ে এল বুড়োর নাতনি। অদ্ভুত নাম—চম্পা······ম্যাগনোলিয়া······দুধের গ্লাসটা হাতে ধরে এমন হাসি পেল এভারেটের। আরনল্ড প্রেটারসের ডে-স্কুল······বটানি ক্লাসে অ্যালবামের জন্য ফুল-পাতা সংগ্রহ করে ল্যাটিন নামগুলো মুখস্থ করা, স্কটল্যাণ্ডে ছুটি যাপন আর লেক্ডিসট্রিক্ট-এ পথ হারিয়ে নেভিলের সঙ্গে এক চাষীর কুটিরে গিয়ে রাত কাটানো······টেবিলে বসে বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে এক-

সঙ্গে প্রার্থনা করা—Hallowed Be Thy Name—এই সবগুলো কেমন অর্থহীন হয়ে গেল। সে জীবনটা সে—এভারেট শেরিডান, 84th ইন্‌ফ্যান্‌ট্রির সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ার—কোনোদিনও কাটায় নি। সে সব অন্য কোথাও, অন্য কারো জীবনে ঘটেছিল।

ভয়ে ভয়ে চম্পা দুধের গেলাসটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। এভারেট হরচান্দকে বলল—ডুলি মিলতে কত দেরি আছে?

কোম্পানিকী দয়া মেঁ······বলে হরচান্দ্ লাঠি ঠকঠক করতে করতে বেরিয়ে গেল। মাথার নিচে দু-হাত দিয়ে এভারেট চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। এই নোংরা চেহারার বুড়োটা নাকি খুব বিশ্বাসী। বাড়িতে আর একজন পুরুষমানুষও আছে, লম্বা-চওড়া, চোয়াড়ে চেহারা। মুখ দেখলে তো নেটিভ মাত্রকেই গুলি করতে ইচ্ছে করে। তবে এরা নাকি লুঠতরাজ কোনো কিছুতেই যোগ দেয়নি। আর এখন তো ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে সবাই। হ্যাভলক মানুষ ধরে ফাঁসি দিতে দিতে এসেছেন! মরতে কে না ভয় পায়! এরা সেইজন্যেই বিশ্বাসী সাজছে কিনা কে বলবে। কানপুরে তদন্ত কমিশন বসবে। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী দোষী-নির্দোষ সাব্যস্ত হবে। লুঠের মাল যার কাছ থেকে বেরুবে····

বোধ হয় ডুলি এসেছে। নিচে বাদানুবাদ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ উত্তেজিত গলা শোনা গেল ব্রিজলালের—কে বলেছিল তোমাকে ছুটোছুটি করতে? ডুলিতে কাঁধ দিতে বলছ আমাকে? বেয়ারা কম পড়েছে তাতে আমি কি করব? সব তাতেই বাড়াবাড়ি তোমার···নিজে পারো না। আমাকেও বিশ্বাস করো না···আমি গেলে ঠিক বেয়ারাকে ধরে আনতাম··পয়সা নেবে কাজ করবে······

—চুপ কর্ ব্রিজলাল, চুপ কর্······

—আসলে তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না······

—ব্রিজ······!

—আমাকে বেরোতে দাও না·· ···

—দাদা!

চম্পার গলার আর্ত মিনতি শোনা গেল! কৌতূহলী এভারেট কান খাড়া করল। ভাঙা-ভাঙা গলায় মেয়েটি বলছে—দাদা যা বলছে তা তো ভালোর জন্যেই ·····তুমি যে সেদিন উধমজী'র সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে······সকলে তো তা মানবে না······যদি কেউ বলে যে সতীচৌড়া ঘাটে ছিলে তুমি?

উধমজী······নিশ্চয় কারো নাম··· ·নামটা মুখস্থ করলে এভারেট।

—আমি যে কি ভয়ে দিন কাটাচ্ছি····· কেউ কি ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করবে?····· চারপাশে শুধু চোরা খবর ছড়াচ্ছে···লখপতিয়ার কথা ভাবো···কোনো বিচারের আগেই ভজন সাহাকে ফাঁসি দিল···আমি কি লখপতিয়ার মতো বিধবা হবো, তা-ই চাও তুমি?

এভারেট উঠে দাঁড়ালো। সে কি কোনো ষড়যন্ত্রের কথা শুনছে?······কি ব্যাপার? তার পিস্তলটা পড়ে গেল মাটিতে। শব্দ হল। আর হঠাৎ একসঙ্গে কথাবার্তা থেমে গেল। এভারেট ডাকল—কোঈ হ্যায়? ছুটতে ছুটতে ঢুকল হরচান্দ্। ভয়ে কুঁকড়ে গেছে রেখাঙ্কিত মুখখানা। থরথর করে কাঁপছে ঠোঁট। বলল—হাঁ হুজুর, মেহেরবান······ডুলি এসে গিয়েছে······এক বেয়ারা কম······

—চলুন সাহেব···দরজায় এসে দাঁড়াল ব্রিজলাল। হরচান্দ্‌কে বলল—আমি যাচ্ছি সঙ্গে। দেয়ালের সঙ্গে প্রায় মিশে এসে দাঁড়াল মেয়েটা।

—টোটা কোথায়? বলল এভারেট।

—দিচ্ছি···

চম্পাকে অবকাশ না দিয়েই দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল

এভারেট। দেয়ালের গায়ে সামান্য রোদ এসে পড়েছে। পেরেকের গায়ে ঝুলছে টোটার মালাটা। তার পাশেই চকচক করছে কি যেন। পিঠের যন্ত্রণায় টেবিল ধরে বেঁকে গিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে নিরীক্ষণ করে দেখল জিনিসটা। বলল—উতারো।

রুপোর চেনের সঙ্গে পুরোনো ঢঙের একটা লকেট। দেখে রক্ত ছলাত ছলাত করতে লাগল এভারেটের শিরা-উপশিরায়। Awarded to Mrs. Margaret E. Sheridan, On the excellent occasion of.......

—আপনি মেমসাহেবকে জানেন হুজুর?······হরচান্দের প্রশ্নের জবাব মিলল না। এই লকেটটার সঙ্গে এভারেটের কৈশোর ও বাল্যের অনেক স্মৃতি জড়িত। হরচান্দ্‌কে ঠেলে সরিয়ে দিল চম্পা। ঘোমটা খুলে ফেলল। বলল—হুজুর, শেরিডান সাহেবের বিবি আমাকে খুব পছন্দ করতেন। যখন ঘরে যাবার কথা হল, তখন আমাকে উনি মেহেরবানি করে এই মালা আর...

—আর কি?

—এক সেলাই বাক্স দিয়েছিলেন—

—দেখাও···

খুলে দেখাল চম্পা। 'মার্গারেট শেরিডান' নাম খোদাই করা কোনায়। এভারেট জ্বলন্ত ঘৃণাভরা চোখে তাকাল তাদের দিকে। ভয়ঙ্কর কোনো সম্ভাবনার ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠল, শ্বাস-রোধকারী হয়ে উঠল বাতাস।

একমিনিট·· ···দুইমিনিট···মাটিতে আছড়ে লম্বা হয়ে পড়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল চম্পা—হুজুর আপনি যা ভাবছেন তা নয়...আপনি অন্য কিছু ভাববেন না····· অন্য কিছু ভাববেন না··· ···এ সাহেবদের কুঠি লুঠের মাল নয়······

জুতোর শব্দে পাথরের মেঝেতে ঝড় তুলে ঘরে ঢুকল চারজন

ইংরেজ সৈনিক। স্ট্রেচার তাদের সঙ্গে। এভারেটের হাতে রুপোর লকেটটা দেখে থেমে গেল তারা।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল হরচান্দ্। ব্রিজলালও হতবুদ্ধির মতো পাশে বসল···মাটি থেকেই জলভরা চোখ সকলের দিকে তুলে বোবা হয়ে গেল চম্পা।

প্রত্যেকের চোখে ফুটে উঠছে দণ্ডাজ্ঞা। কোম্পানিকী দয়া মেঁ···হরচান্দের গলায় কথাটা ভয়ে ফুটতে পেল না। তবু রুদ্ধগলায় বলল—কোম্পানিকী দয়া মেঁ·····

সমরকালীন জরুরী তদন্ত কমিশন অবশ্য ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করল কিন্তু সে শুধু আইনের ব্যাপার। তাতে বিচার উলটে গেল না। বারবার বলেছিল বটে খোঁড়া বুড়ো—শেরিডানের বিবি তার নাতনিকে দিয়েছিলেন জিনিসগুলো। কিন্তু কে না জানে এসব বাস্তবে ঘটে না। নেটিভ একটা মেয়েকে ব্যক্তিগত স্মারকচিহ্ন উপহার দেয় কোনো ইংরেজ মহিলা? এরকম পাগলামি কি কেউ করে? প্রশ্নরত শেরার সাহেবকে বুড়োটা প্রাণের মায়ায় বলেছিল—হাঁ হুজুর, বিবি শেরিডান পাগলই ছিলেন···

—কি বলছ?

—নইলে কেন দিয়েছিলেন বলুন আমার নাতনিকে?

—Withdraw, withdraw···

—না হুজুর, পাগল ছিলেন না···

—বল্ দোষ করেছিস?

—হাঁ হুজুর·· কোম্পানিকী দয়া মে···

তখন ব্রিজলাল সঘৃণায় বলেছিল—বুড্ঢা, কোম্পানির দয়ায় তুমি ফাঁসি কাঠ অবধি পৌঁছে গিয়েছ। এখন ও মুর্দা কথা ছাড়ো।

—Stop his mouth··

—একবার হাত খুলে দিতে পার সাহেব, এই কাপুরুষ বুড়োকে আমিই গলা টিপে খতম করে দিই···কেন, মরতে শেখো নি? দয়া চাইছ? ভিক্ষা করছ?

—ব্রিজ, চম্পা···আমার চম্পা···

হরচান্দ্ ভেউ ভেউ করে শিশুর মত কেঁদেছিল। তাদের বয়ালগাড়িতে চড়িয়ে গাছের নিচে নিয়ে ফাঁস পরাতে পরাতে মেথরটা হাসছিল। কোম্পানিকী দয়া মেঁ···কোম্পানির দয়ায় ওকে সিধা স্বর্গে পাঠিয়ে দাও···সৈনিকরা বলছিল। স্বর্গে চলে যা ব্যাটা···বলে হাসছিল সিপাহীরা।

কয়েকমাস কেটে গিয়েছে।

ম্যাক্স্‌ওয়েলের বিজয়ী বাহিনী কাল্পিরোডের ধারে ভগবানপুরে ক্যাম্প করেছে। পরিত্যক্ত গ্রাম। গ্রামবাসীরা পালিয়েছে ইংরেজ আসবার আগেই। অফিসার-ক্যাম্পের সামনে ধুনি জ্বলছে। তার তাপে মাঘ মাসের শীত টের পাওয়া মুশকিল। সামনে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে খাট, চৌকি, খাটিয়া, আলনা, ছোটছেলের দোলনা। সেগুলো আছড়ে ভেঙে শিখ সিপাহীরা ধুনির মধ্যে ফেলছে। গাঁয়ে আগুন দিতে পারলে মজা জমত ভালো। কিন্তু বেশ কিছু গোলাবারুদ, বন্দুক মিলেছে। তাতে যদি আগুনের হলকা এসে পড়ে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে।

শিখ সিপাহীদের জমায়েত। নৈশ-ভোজনের পর বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে উল্লাস চলেছে। আজ একটা সুবর্ণসুযোগ এসেছিল। সন্ধ্যের সময় গাঁয়ের অদূরে ঝোপের মধ্যে ঝুড়ি-বোঝাই বোতল বোতল দেশী মদ পাওয়া গিয়েছে। বয়ালবিহীন একটা গাড়িতে মদের বোতলগুলো নিয়ে বসে ছিল একটি মেয়ে। বয়াল নিয়ে আসবার নাম করে সঙ্গী পুরুষটি পালিয়ে গিয়েছে। মেয়েটার

সঙ্গে দলবল নিশ্চয় ছিল। নইলে ভাঁটিখানা চালু করল কে? নিশ্চয়ই সে একা নয়। যাই হোক ইংরেজের সঙ্গে দুশমনি করবার থেকে এ কাজ যে অনেক ভালো, তাতে সন্দেহ নেই। মেয়েটা দেখতে সুন্দর, কিন্তু মেজাজ যেন সাপের মতো। কানে বড় বড় আংটা, পরনে ঘাঘরা, মাথায় রুমাল বাঁধা, ইরানি মেয়ে হবে। ধরা পড়তে দাঁতে একটা ছোরা কামড়ে ধরে, হাতে পিস্তল নিয়ে লড়তে এসেছিল। সাহেবদের বারণ আছে তাই—নইলে শিখরা দেখিয়ে দিত যে, কেমন করে সায়েস্তা করতে হয় এইসব মেয়েকে। শিখ সিপাহীদের সঙ্গে সে ঝগড়া করতে করতে এল। বেতের গাছের মতো ছিপছিপে শরীর। ফুঁসে ফুঁসে উঠছিল রাগে। পুরুষগুলোকে পেছনে রেখে রানীর মতো সগর্বে নিজেই আসছিল আগে আগে। সে তাদের মালিক, এমনই ভাবখানা। সাহেবের কাছে এসে মাটিতে শুয়ে পড়ল সেলাম জানিয়ে। ভালো অভিনয় জানে। বিনয় ও ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে ছোট ছোট কথায় জানাল যে মদের বোতলগুলো কোম্পানিসাহেবের সেবায় ছেড়ে দিয়ে সে চলে যেতে চায়। দাম সে চায় না। কোম্পানির কাছে সে এমনিতেই কৃতজ্ঞ। এভারেট সাহেবের দয়ার প্রাণ। যুবতী দেখে পাঁচটা টাকা ফেলে দিলেন মেয়েটাকে।

তখনই চলে না গিয়ে মেয়েটা জাঁকিয়ে বসল। বলল—সাহেব, সাপের ওষুধ নেবে? কোনো খেলা দেখবে?

অন্যান্য সাহেবেরা ভিড় করে দাঁড়াল। বলল—নাচ-গান কিছু জানো না কি?

নাচতে জানে না বটে, কিন্তু গান গাইল মেয়েটা। ধুনির আগুন কমে এসেছে। কাঠকয়লার অঙ্গারের আভায় কালো চোখে ঝিলিক খেলছে। লম্বা বেণীদুটো লুটিয়ে পড়েছে কাঁধ দিয়ে। মাটিতে ঘাঘরা বিছিয়ে বসে মেয়েটা যখন গান গাইল, দেখতে তো ভালোই লাগল, কানে যেমনই শোনাক না কেন গান।

—হাত দেখতে জানো নাকি ?

প্রশ্নটা শুনে মেয়েটা খিলখিল করে হাসল। বলল—কানপুর রেজিমেণ্টে যাব সাহেব, হাত দেখে দেব তোমাদের। টাকা নেব, কাপড় নেব। এখন আঁধার হয়ে গিয়েছে, ঘরে যাব না ?

—কোথায় ঘর তোমার ?

—এই তো হুজুর একটু আগেই। তোমার সিপাহীদের দাও না, দেখে আসবে ঘর।

দুজন সিপাহী সঙ্গে চলল, ক্যাম্প ছাড়িয়ে এসেই চোখে চোখে ইশারা করে পরস্পর হাসল। মেয়েটিকে বলল—পিয়ারা, একটা গান শোনাবে ?

মেয়েটা বলল—একটা বেচালের কথা বলেছ কি সাহেবকে বলে দেব।

—আরে রাগ করো কেন ?

মেয়েটার বাড়িতেই বোধহয় আলো জ্বলছিল। কাছাকাছি এসে মেয়েটা বলল—এবার তোমরা যাও সিপাহীজী। ক্যাম্পে যাও, মৌজ কর।

মেয়েটার গলায় কিছু বিদ্রূপ ছিল কি ? মুখে হাসি ছিল ? অন্ধকারে বোঝা গেল না। ক্ষেত পেরিয়ে টপকে চলে গেল মেয়েটা।

এই সব লুটের মালের মতো বোতলগুলো নিয়েও জমা করতে হবে নাকি—এই নিয়ে যখন তর্ক চলেছে তখন ত্রিশ-বত্রিশ সালের পাকা লড়িয়ে বুড়ো জঙ্গীরা ছোকরা-গোরাদের টিটকিরি দিতে লাগল। মুলতান, বক্সার আর বোম্বাই-এ কখনো-সখনো দেশী জিনিস খেয়ে দেখেছে তারা। নেশার কথা ? ইয়ংম্যান, এরা কি জানবে। আফগান লড়াই'এর সময় হরদম কান্ট্রির বোতল ফুঁকে দিত গোরাগুলো। নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকত। তখন তাদের ওপর ছুরি চালাত সার্জন সাহেব। কান্ট্রিলিকারের গুণের কথা

বলতে গেলে এখনো ম্যাকনীলের চোখ দিয়ে জল পড়বে। Glorious thirties—! ছোকরা লরেন্স কি গানই বানিয়েছিল কান্ট্রি নিয়ে। কোথায় গেল সেইসব দিন? পেট্রিক পড়ে আছে সাহাবাদের কবরখানায়, আর লরেন্স হয়ে গিয়েছে মস্ত বড়ো মানুষ।

—কান্ট্রির ওপর ভোট নেব নাকি? —বলতে গিয়ে কানিংহ্যাম ধমক খেল। —লে-আও, লে-আও। হুকুম পেয়ে দৌড়ল দুইজন শিখ সিপাহী।

বোতলগুলো খোলার আগেই কিন্তু দেশী সিপাহীর জমায়েত থেকে হৈ-চৈ শোনা গেল। ছুটতে ছুটতে এল একজন ছোকরা। সামরিক রীতিনীতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ছুটে এল সাহেবদের মাঝখানে, এর ঘাড়ে হাত দিয়ে টপকে, ওর গায়ে ধাক্কা দিয়ে। বলল—হুজুর, জহর······পুরা জহর······জ্বলে গেলাম!

উপুড় হয়ে পড়ে গড়াতে গড়াতে আগুনের কাছাকাছি গিয়ে কয়েকটা ঝাঁকুনিতে আক্ষিপ্ত হয়ে চুপ করে গেল ছোকরা। মুখ দিয়ে গড়াতে গড়াতে মাটিতে পড়তে লাগল ফেনা।

ভয়াবহ মুহূর্ত কয়েকটা। সকলেই নিস্তব্ধ। কালো কালো বোতলগুলোর ওপর আগুনের শিখার আভা নাচছে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সাহেবরা। তিন ঘণ্টা হয়েছে মাত্র। সেই মেয়েটা কখনোই পালাতে পারে না বেশি দূর। নিশ্চয় কাছাকাছি আছে।

মেয়েটি ধরা পড়ল ভোরবেলা। যমুনার ঘাটে খেয়ামাঝিকে টাকা কবুল করে তাড়াতাড়ি নৌকো ছাড়তে বলছিল সে। ভয়ার্ত চাহনি। এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। সঙ্গে কোন জিনিসপত্র নেই। একরাতে দশমাইল পথ এসেছে কেমন করে কে জানে। নিশ্চয় প্রাণের ভয়ে।

শিখ সিপাহীদের ওপর হুকুম ছিল এতটুকু যেন ক্ষতি না করা হয়। ধরে নিয়ে যাবার হুকুম ছিল শুধু।

মেয়েটি একবার তাকাল সামনের দিকে। যমুনার ওপারে অনেক দূরে রয়েছে ভারতীয় ছাউনি। একবার যদি পেরিয়ে যাওয়া যেত। বিস্তীর্ণ চড়া। জলের ওপর জমে রয়েছে নীল কুয়াশা। নৌকোর ছাউনিতে, পাড়ের ঘাসে, গাছের পাতায় শিশির জমে রয়েছে। তরল আঁধারের মধ্যে সাদা কুয়াশা কোনো স্বপ্নরাজ্যের বিভ্রম রচনা করেছে। প্রশান্ত সুন্দর পরিবেশ।

দৃপ্ত ভাবেই তাকাল মেয়েটি। শিখ দুজনকে উচ্চ গলায় বলল—মাঝিকে কিছু বোল না। ওর কোনো দোষ নেই। ও আমাকে চেনে না। ঘাঘরার প্রান্ত দুই হাতে একটু উঁচু করে ধরে স্বল্প জলে ছপছপ করে সে পাড়ের দিকে এল। পাড় দিয়ে উঠতে উঠতে ঝক্‌ঝকে দাঁতে ঝিলিক দিয়ে হাসল একটু। বলল—একটা মেয়েকে ধরতে এসেছে এতগুলো মরদ!

রূঢ় ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে তুলে নিল একজন। বলল—বন্ধ কর, তোর দিল্‌লাগি দেখতে কে চায়?

যখন তাকে ধরে আনা হল ক্যাম্পে, ধুলোমাখা ক্ষতবিক্ষত পা, হাতদুটো মুচড়ে পেছনে নিয়ে বাঁধা, এলোমেলো চুল। সাহেবদের মুখে কথা ফুটল না। তার দিকে তাকিয়ে অজ্ঞাতসারেই কোন কোন অনভিজ্ঞ সৈনিকের চোখে তারিফ ফুটে উঠল। হ্যাঁ, সাহস রাখে বটে। কিন্তু কেন? কেন এই নিষ্ঠুরতা। সুগঠিত শরীর, যৌবনের আশীর্বাদে লাবণ্যধন্য তনু এই মেয়ের মধ্যে কেন হিংসা আসে? কেন বর্বরের মতো হত্যার আদিম প্রবৃত্তি জাগে? রহস্যময় প্রাচ্য! দুর্জ্ঞেয় হিন্দুস্থান আর তার মানুষ!

তখনই সমাপ্ত হতে পারত বিচার, কিন্তু কোনমতে যদি দলটার সন্ধান পাওয়া যায়, আর কে কে আছে যদি ধরা পড়ে? এই সব কথা বিবেচনা করলেন সবাই। তবে যা করবার তাড়াতাড়ি সেরে

নিতে হবে। ক্যাম্প গুটিয়ে কানপুর ফিরবার তাড়া আছে। প্রত্যেকটি দিনের দাম আছে। সময় অযথা নষ্ট করা সম্ভব নয়।

জেরা শুরু হতে প্রকাশ পেল মেয়েটির অনমনীয় অবাধ্যতা। কেউ তার সঙ্গে ছিল না। মদ-চোলাইয়ের কোন কারবার কাছাকাছি নেই। এ লুঠের মাল। পলায়নপর ভারতীয় ফৌজের গাড়ি থেকে সে পেয়েছিল। বিষ? সে নিজেই বানিয়েছে। কিছু কিনেছে, কিছু তৈরি করেছে। কেন?

—সঙ্গে বিষ না রাখলে কোন্ ভরসায় তোমাদের ছাউনিতে আসব?

গালাগালি করল সাহেব। বেলা বাড়ছে। রোদ চড়ছে আকাশে। সবাই তাঁবুতে বসে আছে। মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে তাঁবুর সামনে রোদে। সকলের নজরবন্দী। নিজেকে একটা জানোয়ার মনে হচ্ছে তার। এতগুলো লোক, সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি তার উপরে।

—কিছু বলবে?

—শেষ করো সাহেব, জলদি করো।

—জরুর। এত জলদি করব যে সিধে পাঠিয়ে দেব জাহান্নামে। বলো, কেন বিষ এনেছিলে?

—শুনবে সাহেব?

সওয়ালরত বিচারককে কি বললেন একজন। —এটা নাটক করবার সময় নয়। তাড়াতাড়ি শেষ করো।

—শেখাতে এসো না আমাকে—বিচারক চটে গেলেন—বলো··· বলো···

—সাহেব, সত্যি কথা··· কালকের গান গাওয়া গলা আজ ধুলো ও তৃষ্ণায় চিরে চিরে যাচ্ছে। মেয়েটি বলল— সাহেব, তোমরা বেইমানি করেছ।

জবান্ রুখ্! সাহেবের অবমাননায় উত্তেজিত এক বৃদ্ধ শিখ

চেঁচিয়ে বলল। মেয়েটি তার দিকে চেয়ে হাসল। বলল—সাহেব কোনোদিন যদি তালাস করে জানতে পারো তো জানবে, কানপুরের বুড়ো শেরিডানের বিবি আমাকে কতকগুলো জিনিস দিয়েছিল ভালোবেসে। তাকে লুঠের মাল বলে জাহির করল সাহেব, শেরিডানের ভাতিজা।

স্তম্ভিত এভারেট এগিয়ে এল। তার দিকে চোখ তুলে মেয়েটা বলল—আমার বুড়ো দাদা আর আমার স্বামীকে ফাঁসিতে লটকে দিলে তোমরা। ফাঁসে মরল বলে তাদের চৌথাক্রিয়া কিছু হল না। বলো—বিবিঘরের খুনের জন্যে কতজনকে মেরেছ তোমরা?

এই জবানবন্দীর জবাবে চোখে চোখে লেখা হয়ে যায় বিচার। উঠে দাঁড়ায় সবাই। গলা ভেঙে যায় তবু বলে চম্পা—আফশোস যে তোমাদের কারো জান নিতে পারলাম না।······

—চুপ করো, চুপ করো, stop her mouth.

—তোমাদের শাপ দিচ্ছি আমি······এর বিচার হবে···বিচার হবে ··নয় তো মিথ্যে হয়ে যাবে জমানা।

ধাক্কা দিতে থাকে দুজন সিপাহী। বিস্রস্ত চুল বাতাসে উড়ে ঝাপটায় চোখে মুখে কপালে। প্রত্যেকের মুখ কিছুক্ষণ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেখে সমস্ত জমায়েতটার প্রতি থুথু ফেলে চম্পা বলে—সব বে-হিম্মত, কাপুরুষ!

মাঝরাতে পরিত্যক্ত গ্রামের পথ খুঁজে খুঁজে এল কয়েকজন সওয়ার। সকালে যেখানে তাঁবুর খুঁটি ছিল, সেখানে কাড়াকাড়ি করছিল শেয়াল। মানুষ দেখে পালিয়ে গেল শবদেহ ছেড়ে।

গভীর গর্ত খুঁড়ে নীরবে চম্পার দেহ সমাধিস্থ করল তারা। কাঁটা ঝোপ এনে ঢেকে দিল মাটি। একজন বলল— শেষ পর্যন্তও কিছু ফাঁস করে নি চম্পা।

কপালে হাত ছুঁয়ে সম্মান জানাল আর সবাই। তারপর পার হয়ে ওপারে ভারতীয় ছাউনির পথ ধরল।

পরম আত্মীয়

অফিস ঘরের কলগুঞ্জন কানে আসছে। টাইপ-রাইটার কাজ করে চলেছে খটাখট্…খটাখট্…খটাখট্; ফ্যান ঘুরছে বোঁ বোঁ করে। ক্লাইভ বিল্ডিংয়ে এই অফিসটা নতুন নেওয়া হয়েছে।

ড্যানিশ ফার্মটা উঠে গেল মিশন রো-এ। তারফলেই সম্ভব হলো এই জায়গা পাওয়া। এই যাওয়া আসার মাঝখানে যে টাকাটা হাত বদল হলো, তার অঙ্কটা মনে করতে-ও ভয় হয় আমার। এত টাকা পৃথিবীতে আছে? অথচ কি সহজেই টাকাটার কথা বলেছিলেন অবিনাশ বাবু আমার বোনের বিয়েতে। কাকীমার সেজ জামাইবাবু অবিনাশ মুখোটি-কে নিয়ে যে রকম সঁরগরম পড়েছিলো,—তাঁর কাছে বর আর বরপক্ষ তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিলো। উনিশ হাজার টাকার গাড়ী দাঁড় করিয়ে রেবার হাতে চারটি টাকা গুঁজে দিয়ে এক গেলাস ঘোলের সরবৎ খেয়ে আবার গাড়ীতে উঠতে যেটুকু সময় লেগেছিলো তারমধ্যেই অবিনাশ বাবু সেই আশ্চর্য অঙ্কটার কথা শুনিয়ে বলেছিলেন—

—এত করে তবে অফিসটা পেলাম!

অত টাকা শুধু পাটিগণিতে-ই থাকে জানি। রাম অতি স্বচ্ছন্দে শ্যামকে সেই টাকা ধার দেয়। আবার চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ জুড়ে সেই টাকা গিয়ে ওঠে যদুর ঘরে। আমাদের সম্মিলিত ক্ষমতায় তিন হাজার টাকা ধার করে টেলারিং পাস ছেলের সঙ্গে রেবার বিয়ে দিচ্ছি। অবিনাশ বাবু আমাদের সেদিন বিভ্রান্ত করে রেখে গিয়েছিলেন।

নতুন অফিসের রিসেপ্সন রুমের সবটুকুই সবুজ। পালিশ

ছাড়া স্বাভাবিক রঙের দামী কাঠের ফার্নিচার সমুদ্র-সবুজ কার্পেটের ওপর ছড়িয়ে আছে। সবুজ প্লাষ্টিকের পর্দায় মনোরম, ম্যাগাজিন বিক্ষিপ্ত সুন্দর ঘর। দশটা থেকে বসে আছি। এখন বাজল তিনটে। এর মধ্যে একবার মাত্র খেতে বেরোলেন উনি। একবার দেখা করলেন একটি ছোকরা সাহেবের সঙ্গে। এখন কি করছেন ভাবতে চেষ্টা করি। বিলিতী ম্যাগাজিনের মলাটের লোভনীয় খাবারগুলোর ছবি থেকে চোখ ফেরাতে পারি না। কারা খায় ও সব খাবার? উনি কি করছেন? হয় চিঠি লিখছেন, নয় চেয়ে আছেন টাইপিষ্ট মেয়েটির দিকে। ছিপছিপে সুন্দর বাঙালী মেয়েটি। পাঞ্জাবী ষ্টেনো মেয়েটির সঙ্গে খুটখুটে জুতোয় শব্দ তুলে যাওয়া আসা করে দেখেছি। সম্ভবতঃ তারই সঙ্গে কথা বলছেন অবিনাশবাবু। বাবু কি করছেন, ঐ বেয়ারাটাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে থাকলেও জিজ্ঞাসা করতে পারছি না। সেটা দস্তুর নয়। বে-দস্তুর কিছু আমি করতে পারি না। তাতে অফিসে মাথা হেঁট হবে কাকীমার সেজ জামাইবাবুর। আমি যে ওঁর আত্মীয়, সে কথা অবিশ্যি কেউ জানে না। তারা জানে আমি উমেদার মাত্র। সেই কত লাখ কত হাজারের একজন, যাদের নাম এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে লেখানো থাকে আর বারবার ঝালাই হয়। সকালে কি খেয়ে বেরিয়েছি? ভুলে গিয়েছি। ক্ষিদেয় পেট জ্বালা করছে। অবিনাশ বাবুর বাড়ীতে কতো রকম এ্যালার্জির কথা শুনি। জয়ামাসীর না কি মাছ দেখলেই এ্যালার্জি হয়। একটু সিদ্ধমাংস আর একটু সাদা সস্‌…কেমন ক'রে যেন উচ্চারণ করেন জয়ামাসী? ভাবতে গিয়ে-ও কষ্ট হলো। মাংস আর সস্‌…সস্‌ আর মাংস…।

কিন্তু এমনি করেই কষ্ট করতে হয়। তাহ'লে বড় হওয়া যায় জীবনে। হওয়া যায় অবিনাশ মুখোটি।

চারটে বেজে সাতাশ মিনিটে বেরুলেন উনি। আমি শশব্যস্তে

উঠে দাঁড়াই। বললেন—

—আরে? মণি যে? কতক্ষণ?

—আজ্ঞে, এই দশটা থেকে···!

—তাই না কি? টু ব্যাড্··· দুষ্টু মেয়ে আমাকে খবর দেয়নি।

দুষ্টু মেয়ে মানে রিসেপ্সনিষ্ট ভায়োলেট দত্ত। চুলের পোনি-টেইল নাচিয়ে সে সুন্দর করে হাসলো। অবিনাশ বাবু তাড়া দিলেন আমাকে—

—চলো···চলো মণি, বেরিয়ে পড়ি।—গাড়ীতে বসে ড্রাইভারকে বললেন—

—মোকাম্বো।

ঢুকলাম মোকাম্বো-তে।

তারপর বললেন—বেচারা, বারের লাইসেন্স পাচ্ছে না কিছুতে! ভাবতে পারো?

মোকাম্বোর চারপাশে তাকিয়ে মালিকের দুঃখে দুঃখী হবার সাহস হলো না। উনি বললেন—

—কিছু আলু ভাজা দিতে বলো। আর চিজ-স্ট্র! কফির সঙ্গে সর্বদা হালকা কিছু খাবে জানলে? কি যে গ্রামাতা আমাদের! কাফে মানেই চপ কাটলেট, মোগলাই পরোটা।

নামগুলো শুনেছি। খাইনি কখনো। ছোট ভাইয়ের জুতোর মধ্যে পা দুটো টন্‌টন্ করছে। বিগলিত বিনয়ে কফিতে চুমুক দিই। অবিনাশ মেসো বলেন—

—মণি, প্রেমে পড়েছো কখনো?—জবাব জোগালনা মুখে। কান লাল হয়ে গেল। সবেমাত্র ধার কর্জ করে আই. কম. পাশ করেছি। বয়েস হয়ে গিয়েছে তেইশ। উনি ভরসা দিয়ে হাসলেন। বললেন—

—তুমি জানোনা মণি! তোমাদের সঙ্গে এ সব কথা কইতে

আমার কি রকম লাগে। মনে হয় যদি তোমাদের বয়সটা ফিরে পেতাম। একদিন···একঘণ্টার জন্যে···আহ্!

ব'লে চট্ করে নিজের মধ্যে ডুবে গেলেন উনি। চারিদিকের নানারকম খাবারের গন্ধে আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। উনি কিন্তু তদ্‌গত হয়ে কাচের টেবিলে ফুলদানীর ফুলের ছায়া দেখতে লাগলেন। ডুব দিয়ে যেন মুক্তো পেলেন এমনি ধারা হেসে বললেন—

—আমার চেহারা দেখে তুমি বুঝবেনা মণি···কিন্তু বিশ্বাস করো, ঢাকার নাম করা মেয়ে শীলা সেন একদিন এই আমাকেই দেখে·······!

তাঁর কৈশোর প্রেমের আখ্যানটি শেষ হলো রাত সাড়ে আটটায়। শেষ দেড়ঘণ্টা বসতে হলো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে। সেখানে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চট্ করে উনি উঠে পড়লেন। ন-টায় না কি মেট্রোতে জয়ামাসী অপেক্ষা করবেন। বাসে চড়ে বাসায় ফিরতে রাত সোয়া ন-টা বাজলো। ফিরে তারপর রাস্তার কলের জলে সাবান দিয়ে সার্ট কাচলাম। প্যাণ্ট ভাঁজ ক'রে তোষকের নিচে রাখলাম। জুতোয় কালি লাগালাম। উদ্যমেই লক্ষ্মী লাভ। কাল সকালে আবার দেখা করতে হবে ওঁর সঙ্গে।

অবিনাশ মেসো আমাদের পরিবারের একটি আদর্শ। আজ নয় আমাদের এই অবস্থা। সেই সাতচল্লিশের আগে, যখন ঢাকায় আমার শৈশব কেটেছে, তখনো তাঁর নাম শুনেছি আমরা। তখন ক্রিমিনাল ওকালতী করে বাবা পাঁচ ছয়শো' টাকা রোজগার করতেন। দাদা মেজদা কলেজে পড়তেন। পুজোতে নতুন কাপড়ের গাঁঠরী বেঁধে আমরা দেশে যেতাম ষ্টীমারে। আমার পৈতের সময় মা নতুন চুড়ি পরে এক দালান মানুষকে পরিবেষণ করছেন, সে ছবিটা আমার আজও মনে পড়ে। তখন অবিনাশ

মেসোর নাম করা হতো অন্য স্বরে। এখন সেই মা-র মুখের দিকে চাওয়া যায় না। দাদা ষ্টেট্ বাসে জয়েন করেছেন। মেজদা আর তাঁর বন্ধু মিলে যা করেন, বাবা অবশ্য তাকে বলেন ব্যবসা। আমরা সবাই জানি মেজদা শ্যামবাজারের দিকে রাস্তায় বসে গেঞ্জি বেচেন। রাত বাড়লে ধূপকাঠি—এক আনা ক'রে! দু' আনা করে! এখন অবিনাশমেসোর নাম করা হয় অন্যভাবে। মানুষের জীবনের সমস্ত সার্থকতার মূর্ত প্রতীক যেন অবিনাশ মেসো। তিনি আছেন বলে ভরসা আছে। স্বাবলম্বিতার মহৎ উদাহরণ। পরিশ্রমই যে সার্থকতার সোপান, তার জাজ্বল্যমান নিদর্শন অবিনাশ মুখোটি।

ছোট বেলা ভোরে উঠতেন। নিজের জামা নিজে কাচতেন। সাবান মাখেন নি। বিলাসিতার বিরোধী ছিলেন। নিজের সব কিছুই নিজে করেছেন। মায় চাকুরীটি জোগাড় করা পর্যন্ত। সে চাকুরীতে চল্লিশটাকা মাইনের ছুঁচ হয়ে ঢুকে, কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর অর্থাৎ ফাল হয়ে বেরিয়েছেন। সম্পূর্ণ নিজের কৃতিত্বে আজ তাঁর আলিপুরে বাড়ী, ক্লাইভ বিল্ডিংয়ে অফিস। গ্যারেজে ষ্টুডিবেকার, লা-মার্টিনিয়েরে ছেলে মেয়ে। আমরা চিরকাল শুনে আসছি মানুষ হতে হয় অবিনাশের মতন।

সেই মতোই চেষ্টা করছি। আগে উনি বলেছিলেন, মণিকে আমার অফিসেই নেবো। হালচাল শিখুক। ঘোরাঘুরি করুক। বাবাকে বলেছিলেন—আমি মার্টিন সায়েবের ওখানে স্রেফ চল্লিশটাকায় ঘসেছি কতোদিন! ভাইবোনকে পড়াতাম, খোলার-ঘরে থাকতাম, আপনি ত' জানেন।

মহাজনের আচরিত পন্থাই তো ধরতে হবে। এক ঠিকে ঝি-এর ভরসায় উনিশজনের সংসার। জামা প্যাণ্ট সাবান দিয়ে কেচে কেচে পোক্ত হলাম। নিজের খরচ টিউসনি করে নিজেই চালাই। জামা প্যাণ্ট করিয়ে নিই। জুতো কিনি। তখন রেবার

বিয়েতে এসে উনি বললেন—শুধু নিজের কথাই ভেবনা মণি। ছুনিয়াতে এসেছো, পরের কথাও ভেব। তুমি ত একা নও, মা, বাবা, ভাই, বোন। কার্ণেগীর জীবনী পড়েছো? রকফেলারের কথা জানো? ব্রিটিশ কাউন্সিলে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করতে পারোনা? —মাথা যেন কাটা গেল। এমন কথা তো উনিই বলতে পারেন! উনি কি সোজা মানুষ? এতখানি স্বার্থপরতা নিয়ে চলাফেরা করছি আমি? বিয়ের খাটাখাটুনিতে পায়ের তলাটা খসে পড়ছে ব্যথায়। একহাতে ডালের বালতি, আর একহাতে কুমড়োর ছক্কার থালা ধ'রে আমি লজ্জায় মরে গেলাম। তখন উনি হাসলেন। এমন সুন্দর হাসি ওঁর! বললেন—

—মুষ্‌ড়ে পড়লে তো? পাগল। পাগল তুমি মণি…এসো, যোগাযোগ রেখো। কাজের খোঁজ পেলেই দেবো। জানো তো কি রকম কম্পিটিসান?

আসা যাওয়া করছি আজ ছয়মাস ধরে। উদ্যমে ভাঁটা পড়লে চলবে না। বাবা, মা, দাদা, মেজদা আমার দিকে খাবার সময়ে এমন করে তাকান যে আমার গায়ে বেঁধে। স্পষ্ট বুঝি, তাঁরা আমাকেই দোষ দিচ্ছেন পদে পদে। অবিনাশ মেসোর সঙ্গে আমার এত আলাপ। সকাল দশটা থেকে রাত ন-টা অবধি তাঁর সঙ্গেই কাটাই। তবু যে কিছু হচ্ছে না —সে জন্যে আমিই দায়ী। নিশ্চয় আমি পারছি না। হেরে যাচ্ছি। তাঁদের নীরব অভিযোগ হাজারটা শলা হয়ে আমাকে বেঁধে! সকাল বেলা মরিয়া হয়ে উঠি। মনকে বলি, আর নয়, আজ যা হয় একটা করবোই।

সামনে গেলেই ভাষা হারাই। সেই চমৎকার হাসি! বলেন—

—মণি! তোমার জয়া মাসী ফোন করেছেন, বিকেলে চা খেতে বলেছেন কাদের। কেক চাই, আইসক্রীম সন্দেশ, ফুল! যাও তো ভাই! এইতো চাই। গুড্‌ বয়!

রজনীগন্ধা, কেক আর সন্দেশের পেছনে ছুপুর ভোর ঘুরি।

তাঁরই তিরিশটাকা পকেটে নিয়ে। তবু এক কাপ চা-এ শুকনো গলা ভিজিয়ে নিতে ভরসা হয় না। হলেই বা ছয়পয়সা বা দু'আনা! অসদাচরণ করা কি সম্ভব? অনেক পুরুষের উত্তরাধিকার আমাকে শাসন করে। পেটে ক্ষিদে চুঁয়ে চুঁয়ে মরে। ফুল দেখে জয়ামাসীর বোন মিনি সরু গলায় বিলাপ করে ওঠে। জয়ামাসী বলেন—আমার টি-সেট্, টেবিলের ম্যাটিং সবই যে হলদে রঙের। লক্ষীটি মণি, কিছু সূর্যমুখী আনো। ভ্যানগগের ছবিটার রিপ্রোডাকশনটার সঙ্গে এমন মানাবে।

আবার ছুটি নিউমার্কেটে। সূর্যমুখী আসে। অভ্যাগতরা আসেন। পেটকাটা জামা আর সোচ্চার যৌবনের ওপর পাতলা নাইলনের আঁচল ঝুলিয়ে মিনি চা ঢালে। আমি প্যান্ট্রিতে বসে চা কেক খেয়ে চলে আসি।

কোনদিন উনি বলেন—চলো, দেখাই তোমাকে রাতের কলকাতা।

ধর্মতলা অঞ্চলের চোরা গলিতে গেলাম ওঁর সাথে। কর্মবীর অবিনাশ মুখোটি আশ্চর্য নৈপুণ্যে হাউসী খেলে চারশো একচল্লিশ টাকা জিতলেন। বেরিয়ে এসে বললেন—

—তোমার পয়ে জিতলাম মণি। বলো কি চাও? চকোলেট খাবে? আচ্ছা চলো।

লোয়ার সার্কুলার রোডের চীনে রেস্তোঁরায় বসে প্রন্‌ফ্রায়েড্ রাইস্ আর ফাউল খেতে খেতে আমার দিকে চেয়ে দুষ্টু হাসতে লাগলেন অবিনাশ মেসো। বললেন—

—এখন থেকে আর ত' ছাড়ছি না তোমায়। খুব লাকি তুমি!

কি জানি কেন, সেই মুহূর্তে-ই বললাম—আপনি আমাকে যা হয় একটা জুটিয়ে দিন মেসোমশায়। আমি কেনা হয়ে থাকবো আপনার কাছে! বাড়ীর অবস্থা জানেন তো?

উনি আহত হলেন—কি আশ্চর্য মণি, এই কথা তুমি বলছো আমায় ? তুমি ? আমি কি তোমার জন্য ভাবছি না ? তোমরা অমনিই মণি, মানুষ এমনিই হয়। ভালবাসতে গেলে আঘাতই পেতে হয় ! কেন সেবার আই. এস. সি. পড়তে বলিনি আমি ? বলিনি, সায়েন্স ছাড়া ভবিষ্যৎ নেই ? রেলওয়ে ওয়ার্কসপে হাতুড়ী ঠুকতে হলে-ও চাই আই. এস. সি. বলিনি ?

আমারই দোষ ! ওঁর কি দোষ থাকতে পারে ? পাঁচবছর আগে ত' উনি সত্যিই বলেছিলেন আই. এস্. সি. পড়তে। সে কথা না ভেবে চিন্তে হঠাৎ আমার বড়দা'র টি. বি. হলো সে ত' ওঁর দোষ নয় !

বাড়ী ফিরতে ফিরতে নিজেকেই ধিক্কার দিলাম। আজ অবিনাশ মেসোর ওপর বিশ্বাস কমছে আমার ? অবিনাশ মেসোর আন্তরিকতায় সন্দেহ আসছে ? শত শত ধিক !

আমার আত্মানুশোচনা দেখে উনি আমাকে ক্ষমা করলেন। আবার ঘনিষ্ঠ হতে দিলেন আমাকে। মিনির জন্যে এল. মল্লিক থেকে রঙ মিলিয়ে উল আনা, জয়ামাসীর চিঠি বরানগরে পৌঁছে দিয়ে আসা, জয়ামাসীব পিয়ানো টিচার ললিতা সিন্‌হার আর ওঁর জন্যে সিনেমার টিকিট কেনা, এই সব কাজের ভার আবার দিলেন আমাকে। অর্থাৎ ওঁর জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র পেলাম এমনি করে।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে কত দিনে কত কথাই যে শোনালেন ! একদিন বাড়ীতে বাগানে বেতের আসবাব ছিটিয়ে বসে এয়ারডেল কুকুরটাকে বল ছুঁড়ে দিতে বললেন—

—টেক্‌নিক্যাল কিছু না জানলে……এই দিনকাল ! আচ্ছা, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এই পরীক্ষাটা দেবার কথা ভাবছো ? কি আশ্চর্য, ভুলেই যাই, তুমি গ্র্যাজুয়েট নও ! দেখ জয়া !

ঘাড় ফিরিয়ে শুনতে গিয়ে জয়ামাসীর আঁচল বুক ছেড়ে মাটিতে

লুটিয়ে গেল। অবিনাশমেসো একটুকরো কেক কুকুরটাকে দিয়ে বললেন—

—জয়া, গ্র্যাজুয়েট হওয়াটা যে কতো তুচ্ছ, এই মণিকে দেখলেই আমার মনে হয়! চব্বিশ বছর বয়েস আর মাথা উঁচু করে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করা! কি যে ভালো লাগে ভাবলে!

কোনদিন বললেন—

—এত শ'য়ে শ'য়ে প্ল্যান হচ্ছে, কলকাতার আশপাশ ত' কলোনীতে ছেয়ে গেল। জমি নিয়ে চাষ করো না? কলকাতার কাছাকাছি কয়েক বিঘা জমির কিছু ধান, কিছু মুরগী—একখানা ঘর তুলে স্বাধীন ভাবে বাস করা। আর কিছু চায় না কি মানুষ? আমি তোমায় বলে দিচ্ছি মণি, এ সমস্যা আজ পশ্চিমে-ও উঠছে। টেলিভিসান আর স্কাইস্ক্রেপার দেখে দেখে আবার চাইছে মাটির স্পর্শ।

কোনদিন বললেন—

—নেভিতে চলে যাও না! ট্রেনিং নিয়ে এসো। আর কিছু করো আর না-ই করো, শরীরটা ত' বানাতে পারবে? স্বাস্থ্য থাকলে আর কি লাগে? কাগজ বেচে-ও ত' দিন যায়।

এমনি করে এগারো মাস হাজিরা দিলাম। জুতো জোড়া ছিঁড়ে গিয়েছে। সার্ট দুটো সেলাই করে-ও আর টেঁকে না। সাবান কেচে যে স্বাবলম্বী হবো সে পথ রাম রাবণ একজোটে ঘায়েল করেছে। পুরোন সার্টে সাবান ঘসা সইবে না। মেজদার ব্যবসা বন্ধ। আমার তৃতীয় টিউশনীটার টাকা-ও সংসারেই লাগে। মাঝখান থেকে চা, চিনি, সাবান এগুলো বিলাসিতার পর্যায়ে চলে গিয়েছে। বাবার মেজাজ আরো চড়া। কিন্তু অবিনাশ মুখোটির সংগে আমার পরিচয় আজও কোন পরিণতিতে এলো না।

আঁধার আকাশে তুবড়ীর মতো একটা খবর সহসা দীপ্যমান

হয়ে উঠল। চাকরি! দাদা যাদবপুর ডিপো থেকে হন্তদন্ত হয়ে এলেন। বল্লেন—

—এ্যাকাউন্‌টস ক্লার্ক নেবে অবিনাশবাবু। একশো' দশ মাইনে! তুই আর দেরী করিসনে মণি, দরখাস্তটা ঠুকে দে', এবার তোর হবেই।

অবিনাশবাবুর সম্মান আমাদের বাড়ীতে এতখানি, যে সবাই ধরে নিলো এবার চাকরীটা আমার হয়ে গেল। আর কোন মতেই বিগড়ে যাবে না। অবিনাশবাবু কথা দিয়েছেন নিজ মুখে।

দরখাস্ত পেশ করে দিলাম। তারপর থেকে দিনগুলো কাটতে লাগল এমন ভাবে। প্রত্যেকটি মুহূর্ত-ও যেন আমার প্রতীক্ষায় ভারী হতে হতে যন্ত্রণায় ফেটে পড়বার মত হলো। দিন কাটে ত' রাত কাটে না। ডাক পিওনের আশায় চেয়ে চেয়ে চোখ ক্লান্ত। খবর আর আসে না।

দশদিন বাদে উনি ডাকলেন। গেলাম অবিনাশবাবুর অফিসে। চাকরীটা আমার হলোই, এই আশ্বাস নিজের মন থেকে নিজেই গ্রহণ করে বলীয়ান হয়ে উঠলেন দাদা। আমাকে একটা সাদা সার্ট আর খাকী প্যাণ্ট কিনে দিলেন বিশ টাকা খরচ ক'রে। অপ্রতিভ হেসে বললেন—এখন থেকে ত' লাগবেই তোর!

মেজদার বন্ধু অনাদি দা' বাটায় কাজ করে। তার মারফতে সস্তায় বাটার জুতো কিনে আনলেন মেজদা।

দাদার কেনা জামা আর মেজদার কেনা জুতো! প'রে যখন বেরুলাম, মনে হলো সমস্ত পরিবারটার আশাভরসা নিয়ে চলেছি আমি।

আমাকে ঢুকতে দেখে বেয়ারাটা অবধি হাসলো। হাসবেই ত'। ওরাই ত' খবর আগে পায়। কাল থেকে আমাকেই সেলাম ঠুকবে ও। কেরানী আর টাইপিস্ট, সকলেই এমনি ধারা সম্মান পেয়ে থাকে। এ হলো কমার্শিয়াল ফার্মের বৈশিষ্ট্য।

এ ত' সরকারী অফিস নয়। সেখানে শ্রীক্ষেত্র। সম্মান শুধু গ্রহ-বিগ্রহের। অন্যদের বেলা সাম্যনীতি।

টাইপিষ্ট মেয়েটি একতাড়া কাগজ হাতে বেরোয়। পাশের ঘরে যায়। আমি আজ দুঃসাহসী। তারদিকে চেয়ে-ও একটু হাসি। সে-ও হাসে। আমার চব্বিশ বছরের বুকে হঠাৎ যেন একটা উত্তাপ অনুভব করি। বেশ লাগে। রক্তটা কেমন ঝিমিয়ে ছিল এতদিন। এখন কেমন তাজা হয়ে উঠেছে। নইলে এতদিনে একবার-ও কি ভাবতে সাহস করেছি, মেয়েটি কতো সুন্দর?

রুমালে হাত ঘষতে ঘষতে হাসতে হাসতে বেরোন অবিনাশ-বাবু। চটপটে ভাবে, তাড়াহুড়ো করে। সুইং ডোরটা ধাক্কায় পেছনে সরে যায়। গানের মতো বলেন—

—চলো, চলো, চলো!

ঝড়ের বেগে আমায় উড়িয়ে নিয়ে আসেন ব্রড্ওয়ে-তে। বলেন—

তোমার-ও সর্দি লেগেছে, দিনটা-ও চমৎকার! আজ সমস্ত নিয়ম-ই অমান্য করা চলে!

ছোট্ট গেলাসে প্রায় বর্ণহীন টলটলে পানীয়। সামনে তাঁর গেলাসটা নিয়ে একটু ঠুকে দেন। হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই খেয়ে ফেলি। আবার ভরে দেন গেলাসটা। আমার মাথা কেমন মেতে ওঠে। উনি নিচু হয়ে মুখের কাছে মুখ এনে বলেন—

—মণি, আমার অফিসের কাজটা তোমার হলো না।···মানে একটু ভালো লোক পেলাম, ঐ তোমার মতো আই. কম.-ই·· তবে তোমার জয়ামাসীর কথা···যা হোক মণি···কিছু ভেবনা··· একটা কিছু আমি করে দেবোই তোমাকে···

চেয়ে থাকতে থাকতেই আমি গেলাসটা খালি করে ফেলেছি। উনিও খাচ্ছেন। সমস্তটা স্বপ্নের মতো অবাস্তব। ওঁর কথাগুলো

অসম্ভব জোরে আমার মগজে পিটতে থাকে। উনি বলেন—আমি যখন আছি তোমার ভয় কি? এঁ্যা! বলি ভয়টা কি?

বলে ঝুঁকে পড়েন। জড়িয়ে জড়িয়ে বলেন—এইতো আসছো! চল্লিশ টাকার মদ খাচ্ছো। উনিশ হাজারের গাড়ীতে চড়ছো··· একশো দশটাকার চাকরী? ছো চ্ছো মণি···ও চাকরীতে তোমার হবে কি?

—মানে?

—মানে পরিষ্কার। যতদিন পারো ভোগ করো জীবনটাকে। মেয়েদের পেছনেই ঘোর। তোমার বয়স থাকলে আমি···

আমার মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়। খুব সাফ দেখি সব। দেখি রং ফর্সা, মোটা, আকাট মূর্খ একটা লোক পুরু লাল ঠোঁট জিব দিয়ে চাটছে আর কি বলছে! উঠে দাঁড়াই। আমার চেয়ে মাথায় এক হাত লম্বা অবিনাশ মুখোটিকে মনে হয় আমার চেয়ে অনেক ছোট। একটা বে-পরোয়া সাহস আসে। দাঁড়িয়ে মনে হয় অনেক ওপর থেকে দেখছি আমি অবিনাশ মুখোটিকে। মনে হয় আমার সামনে বসে গবগবিয়ে মদ খাচ্ছে যে লোকটা তার মতো কুৎসিত করুণার পাত্র আর দেখিনি। বলি—

—চুপ! আর একটা কথাও নয়!

—এঁ্যা?

—তোমার ধাপ্পাবাজি আমি অনেক শুনেছি···তুমি একটি আস্ত বদমায়েস··· মনিবের পা চাটা চরিত্রহীন উল্লুক···তোমাকে আমি এই এমনি করে···

ব'লে গায়ের জোরে একটা চড় মারি। কাঁচের গেলাস বোতল একটা ঝট্‌কায় ফেলে দিই তাঁর মুখে। ফলাফল কি হলো না দেখেই বেরিয়ে আসি নবাবের মতো।

এ হলো কালকের কথা। আজ সকালে ঘুম ভেঙে মাথা ব্যথা করছে। ভাবতে পারছিনা কি করে অমন ধারা ব্যবহার করেছি

কাকীমার সেজ জামাইবাবুর সঙ্গে। এ কাজ না হোক অন্য কাজ, কেরাণী না হোক চাপরাসীর কাজ, এ বছর না হোক অন্য বছর, একটা না একটা কিছু নিশ্চয় জুটিয়ে দিতেন তিনি আমাকে। ওঁর মতো সদাশয়, কৃতী কর্মবীর কি ফেলতেন আমাকে? টিঁকে থাকলেই আখেরের ব্যবস্থা করতেন।

টিঁকতে আমি পারলাম না। নিঃসন্দেহে আমারই দোষ। তবু ত' বসে থাকলে চলবেনা। এবার ধরবো বৌদির সেজ পিসেমশাইকে।

নতুন উদ্যমে জুতোয় কালি ঘষতে লাগলাম।

চিন্তা

মেদিনীপুর জেলার দাঁতন ও কণ্টাই-এর সমীপস্থ অঞ্চল থেকে বছর বছর একদল নরনারী কলকাতায় আসে।

শুধু জ্ঞান নয়, ভাতের নিরাপত্তাও মেদিনীপুরেরই দেওয়া উচিত। কিন্তু দাঁতন, ঘাটাল বা কাঁথি সে-প্রতিশ্রুতি কোনবারই রাখতে পারে না। তাই, হয় বর্ষার মুখে, নয় শীতের ফসল তুলে দিয়ে এরা এসে পড়ে। একেবারে মাঠ-খামারের গন্ধ বেরোয় চেহারা থেকে। অনন্ত, উৎসব, চৈতন্য, অক্রুর এইসব সাউ-প্রধান-মহান্তিরা প্রথমে কর্পোরেশনের ফিটার-প্লাম্বার দাদাদের কাছে ঘোরে। কেউ কেউ সোজা এসে আমাদের পাড়া-প্রতিবেশীর ঘরে অন্যান্য-দেশ-মুখো অনন্ত বা কৈলাসের বদলি স্বরূপ রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে। এক সময় খাল-বিল জলা-জমি দশটাকা কাঠা হিসাবে কিনেছিলেন যাঁরা, সেইসব হিসেবী ঘোষ-বোস-সরকার-চাটুজ্যেদের অধস্তন বংশধরদের কারো কারো আজও রাঁধুনে বামুন রাখবার ক্ষমতা আছে। পিতৃপুরুষের রেখে যাওয়া বাস করবার মতো একখানা-দু'খানা বাড়ি, ক্যানিং-এ ধেনো জমি—এর কল্যাণে মোটা ভাত আর কুঁচো-ট্যাংরার গামলা ভাসানো ঝোলের প্রতিশ্রুতি আজও আছে। সেই প্রতিশ্রুতি-ই এইসব তথাকথিত একান্নবর্তী পরিবারের বনিয়াদ। এ সব পরিবারের ভাত-ঝোলটা একসঙ্গে চলে। এদিকে ঘরে ঘরে আলাদা মিটসেফে স্বামীর রোজগার মাফিক চার-পয়সার দানাদার থেকে চারটাকা সেরের আপেল পর্যন্ত হাজিরা দেয়। এমনিধারা বাড়িতেই ঢোকে এইসব রাঁধুনে বামুন। ঐ ভাতটা নামায়, ঝোলটা বসায়, ঝাল দিয়ে মাছ রেঁধেও খাওয়ায়

সন্তান সম্ভাবিতা ননদদের কখনো। নিজেরা গিন্নীর সঙ্গে পান-সুপুরি, সোডা-সাবানের পাওনা নিয়ে ঝগড়া করে। দুপুরে গাড়িবারান্দায় বসে দেশের লোকগুলোর ওপর মুরুব্বিয়ানা চালায়।

তাদের মেয়েরা ঘর ভাড়া নিয়ে চাক বাঁধে। লোকের বাড়ি-বাড়ি কাজ নেয়—তোলাকাজ, দিনরাতের কাজ।

এদের মধ্যেই আমি চিন্তাকে প্রথম দেখি। মাথায় খাটো, রং ফরসা, হাতে রূপোর বালা, গলায় উল্‌কি দিয়ে হার আঁকা। একটা ছোট মেয়েকে কোমরে দড়ি বেঁধে বসিয়ে রেখে সে কাজ করছিল আমারই পাশের বাড়ি। গিন্নীর ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার আছে। দু'বছরের রোগা মেয়েটা মায়ের পায়ে পায়ে ঘুরবে ঘরে-দোরে—সে তাঁর অসহ্য। চোখে দেখে প্রথমটা আমার গা-ও জ্বলে গিয়েছিল। একেবারে রোগা একটা মেয়ে। বসে আছে গাড়িবারান্দার ধুলোর ওপর। রোগে ভুগে চেহারাটা জ্ঞানবৃদ্ধের মতো। বড় বড় চোখদুটোতে কোনো কৌতূহল নেই। অনেক ক্লান্তি, ক্ষমা আর ধৈর্য নিয়ে সে বসে আছে। পাড়ার ছেলেমেয়ে-গুলো কাছেই দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। একটা পাশব কৌতূহল আর দুর্বলকে খোঁচাবার একটা নিষ্ঠুর তাগিদে তাদেব ছোট ছোট মুখগুলো কিরকম যেন হয়ে উঠেছে। তাদেরও দোষ দিতে পারি না। বহুদিন ধরে বাড়িভাড়ার টাকাটাই শুধু জমার ঘরে পড়ছে। স্নেহ-মমতা সুকুমার-বৃত্তির ঘর বহুদিন দেউলে হয়ে গেছে। এক সঙ্গে থাকবার অভিশাপ এই, যে কতকগুলি মানুষ পরস্পরকে চূড়ান্ত ঘৃণা করে। বড়দের স্নেহহীন সম্পর্কের দায় বহন করে ছোট ছেলেমেয়েরা। মরা সম্পর্কের শব বহন ক'রে বেড়ে ওঠে ব'লে শৈশবেই তারা বুড়িয়ে যায়।

চিন্তার বাচ্চা মেয়েটাকে দেখে আর ছেলেমেয়েগুলোর প্রতিক্রিয়া দেখে মনে একটা আঘাত লাগল। নিজের দেউলে স্বরূপ এমন নগ্ন করে আর কখনো দেখিনি। লজ্জা পেলাম বলেই

নিষ্ঠুর হয়ে উঠলাম। দৈন্য ঢাকবার এমন পন্থা তো নেই। তাই বললাম—বেঁধে রেখেছ কেন? ওর লাগছে না?

—কাজ করিব। ব'লে চিন্তা জন্তুর মতো প্রতিবাদহীন দৃষ্টিতে তাকাল। পাঁজা-পাঁজা বাসন মাজল, তাল তাল বাটনা বাটল। বেলা তুপুরে দেখলাম মেয়েটাকে কোলে নিয়ে ঘরে যাচ্ছে। ভেজা কাপড়ে বেহারী পানওয়ালার অশ্লীল-দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিন্তা আস্তে আস্তে যখন যাচ্ছে তখন দেখে বোঝা গেল কোলের আধমরা বাচ্চাটার দোসর হবার জন্যে আর একজন আসছে। পরে না বলে পারিনি—ঘরে কেউ নেই তোমার? মেয়েটাকে রেখে আসতে পার না?

—মোর কেউ নাই।

ওর কেউ নেই। এই মেয়েটা আর অনাগতটির ভার বহন করে ওকেই বাসার কাজ ধরে চলতে ও চালাতে হবে, এই কথাটা ওর সমস্ত জীবনযাত্রাটা দিয়ে বেরোয় ও যখন পৌষের হাড়-কালানো শীতে ভোরে চান ক'রে ময়লা কাপড় প'রে কাজে হাত দেয়, বেলা দশটায় তুটি বাসি ভাত গাড়ি-বারান্দায় মেয়ের কাছে বসে খায়, অথবা মাসান্তে আটটাকা মাইনের জন্যে দশদিন হাঁটে। ওর অবস্থা নিঃসহায় দেখেই মাইনেটা জোরগলায় বারো টাকার রেট থেকে আটে নামিয়েছেন গিন্নী। সব অবস্থাতেই ওকে প্রতিবাদহীন জন্তুর মতো সহ্যশীল আর নীরব দেখি। সে-টাকা থেকেও কাটা যায়। ও বলে—মা ফাইন করিল। কখনো বলে—কাপড়ালুগা দিল না। ওর অবস্থা দেখে আমার নিজের লজ্জা করে। মধ্যবিত্ত বিবেককে ঘুষ দিই ওকে পুরোনো কাপড় দিয়ে, অথবা মেয়েটার হাতে এটা-সেটা দিয়ে। রাত বারোটায় কাজ সেরে ঘরে ফিরতে—মদ না খেয়ে ঠাণ্ডা মাথায়ই পান-ওয়ালাটা ওকে জাপ্টাতে গিয়ে কাপড়খানা ছিঁড়ে দিয়ে চটচটে হেসে চেঁচিয়ে গান ধরে। সকালে মেয়েটার হাত থেকে রুটিবিস্কুট

বাড়িওয়ালার বৌয়ের নথ-পরানো কাকটা ছিনিয়ে নেয়। বাচ্চাটার কোমরে দড়ি বাঁধা আছে, সে অসহায়, এ সত্যটা কাকটা খুব জানে। এমনি করে বিবেককে জোড়াতালি মারবার চেষ্টাটা আমার মিছে হয়ে যায়—জোড়াতালি সংসারে চলে না।

এর মধ্যেই এল চিন্তার আর-একটা মেয়ে। চিন্তার দলের অন্যান্য ঝি-রা বেশ গুছিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যে। তাদের কাছেই খবর মিলল। ইদানীং আটটাকার কাজটাও ছিল না। ঝি-দের জটলা থেকে উদ্ধার করা গেল যে চিন্তার খুবই দুর্দিন চলেছে। হাতের খাড়ু বাঁধা পড়েছে দশটাকায়। আরো দেখলাম ঝি-রা চিন্তাকে বাসন-বাঁধা নিয়ে টাকা ধার দিতে চাইছে। তারা বলল—ভালো কাঁসা-পিতলের যা বাটি-গেলাস আছে, তা তো ছাড়াতে পারবে না চিন্তা। বুঝলাম, লাভ করবার এ-ও একটা সুযোগ।

ক'দিন বাদে আবার দেখি দুর্বলতায় কাঁপতে কাঁপতে কাজে বেরিয়েছে। বলে—বড়টাকে ছোটটার কাছে রেখে এলাম গো, মা।' গরীব কি একভাবে মরে? —গরীব যে নানা ভাবে মরে, এ কথা বোঝবার জন্যে আমি চিন্তার কাছে যাব কেন? নিজেকে সাধারণ মানুষের দরদী মনে করবার একটা আত্মপ্রসাদ আছে। প্রায়শঃ তার অবস্থিতি অবচেতনে নয়। সম্ভবতঃ তার তাগিদেই আমি ওর ফুটো কপালে জোড়াতালি লাগাবার চেষ্টা করি। কোনো ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার না করে, পরের উপকার করে পরোপকারী নাম কেনবার বাসনাটাও বোধহয় আমার শ্রেণীগতভাবে পাওয়া আর-একটা উত্তরাধিকার। সে উত্তরাধিকারের স্বরূপও গলা-পচা। তাই আমার ছেঁড়া জামা, পুরোনো কাপড়, বাসি রুটি অথবা বাড়তি কমলালেবুর আস্তরে চিন্তার ফাটা কপাল এতটুকু জোড়ে না। তেল-চিট্‌চিটে দেয়ালে ক্যালেণ্ডারের ছবিতে ফুটো ঢাকার মতোই অর্থহীন হয়ে যায়। চিন্তা অবশ্য

সময় পেলে ছুটো কথা বলে যায়। বলে—কারো দোষ নাই। মু পাতকী।

কোন পাপের কথা সে বলে জানি না। ব্যাখ্যা করবার উৎসাহও তার নেই। এ দিকে দিন কাটে। আমার গলিটা দিয়ে যে জীবনপ্রবাহ চলে তাই দেখতে দেখতে রায়দের পাঁচিলটার ফাটলটা বাড়তে থাকে। এ পাঁচিলটা বারোয়ারী ঘুঁটে দেবার জন্যে। পাড়ার বনেদী বুড়ো একজন চাকর দিয়ে হামলা করিয়ে ঘুঁটে ছাড়িয়ে আনেন। তাই নিয়ে লিখিয়ার মা বাড়ির সামনে কুৎসিত কলহ করে যায়। এদিকে নিরুদ্বেগ প্রসন্নতায় কাঠ-চাঁপার গাছটা বারোমাস ফুল ফোটায়। সে ফুলের যে-ক'টা ঝরে পড়ে তাই স্পর্শ বাঁচিয়ে তুলে নিয়ে যান নিত্যবাবুর পিসী শিবপুজোর জন্যে। মানুষের অর্থহীন আচরণ দেখে গাছটার উপরের ডাল-পালাগুলো সোনারোদ মাখামাখি করে হেসে আকুল হয়। সকলে সে হাসি শোনেনা এই যা। এরই মধ্যে দেখি চিন্তার শরীরে মাংস লেগেছে। শহরের গাছপালাগুলোর মতো দুর্বার ক্ষিদেয় সে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা থেকে কেমন করে প্রাণরস আহরণ করেছে। স্বাস্থ্য ফিরেছে। গলার উলকিটা এখন ভালোই দেখায়। সে দিন দেখলাম নতুন কাপড় পরেছে। বলল—মা দিয়েছে। মাইনেও দশে প্রোমোশন পেয়েছে।

সেদিন সকালে খুব হৈ-চৈ পাড়ায়। চিন্তাকে কেন্দ্র করে বলেই মনে হলো। সে এক অভিনব দৃশ্য। ফুটপাথের মাঝখানে নতমুখে দাঁড়িয়ে চিন্তা। ওদিকে দেশ থেকে সদ্য আগত দুজন পুরুষমানুষ একটা ঝুঁটিবাঁধা বছর বারোর ছেলের নড়া ধরে চেঁচিয়ে কি বলছে। ন্যায় এবং ধর্ম যে তাদের পক্ষে এ বুঝতে অসুবিধে হল না। একজনের রং ফরসা, মুখে পান, চুলে সিঁথি—চেঁচাচ্ছে সেই বেশী। চেঁচিয়ে বলছে—তুই পাতকী করিবি তো, দাম দিবি না? চিন্তার দেশের মানুষরা তাকেই সমর্থন করছে। চিন্তার

মুখে কোনো কথা নেই। সে শুধু বলছে—মোক ক্ষমতা নাই। মু অপারগ। ছোট ছেলেটাকে বার-বারই ধরতে যাচ্ছে। তাকে ঝটকা মেরে পুরুষ-দুজন সরিয়ে নিচ্ছে।

দুপুরে চিন্তা এল দরবার করতে। বলল—মোকে গোটে টাকা ধার দিন। মু শোধ করিব।

না জেনে না চিনে টাকা ধার দেব, আবার সে টাকা ফেরত পাব, এত ভরসা নেই। তবু গোড়াতেই 'না' বলি না। ঘটনাটা জেনে নেবার সুযোগ একটা, হাজার হ'লেও। কৌতূহলে কি আমরা কারও চেয়ে কম?

উবু হয়ে বসে চিন্তা। কথা বলতে বলতে নাকের পটিটা ফুলে ফুলে ওঠে। নাক ঝেড়ে আর চোখ মুছে নেয়। কথার মাঝখানে সম্ রেখে বার বার বলে—মু মহাপাতকী। মু হতভাগী।

চিন্তার কথাগুলোতে যে-সব কথা জানি তা আমার কানে নতুন ঠেকে। চিন্তা বলে—যখন বিধবা হলাম, তখন আমার ঐ এক ছেলে গোপাল। আমার চারবিঘা জমি গো মা। দুইখানা টিনের ঘর, ছাগল দুটো, গাই একটা। আমার দুধের বাল্য ছেলে ও, চাষকাজের কি জানে গো মা, আমি আমার পাড়ার মানুষদের পায়ে ধরলাম। মামাশ্বশুর আদি আত্মমানুষরা বলে কি গো মা—তুই নাবালক বিধবা, জমি আমাদের জমা করে দে। আমি রাজী হলাম না। আত্মীয়রা রুখে উঠল। বড় অশান্তি। এদিকে মোক কাঁচা বয়স—সন্ধেবেলা মানুষ আমার আঙ্গিনায় হাঁটতে লাগল। আমি গোপালকে নিয়ে দরজা গড়া দিয়ে রাখি আর ভগবানকে ডাকি। বড় দুঃখের দিন।

বলে আর অল্প অল্প কাঁদে চিন্তা। এমনি সময় কলকাতা থেকে গেল উৎসব। উৎসবের চেহারা ভালো। সে যে কত প্রতিশ্রুতি দিল চিন্তাকে! প্রথমে চিন্তার মন টলেনি। দরজায় আগল দিয়ে বসে থাকত। তখন উৎসব গোপালকে হাত করল। তাকে

মিঠাই কিনে দেয়। ভালো কথা বলে। দেখে দেখে চিন্তার মন নরম হ'ল। এইখানে কাহিনী থামিয়ে চিন্তা বলল—যৌবন বড় দুষ্ট গো মা, শরীরের জ্বালা—মু পাতকী হলাম।

তখন দশজন রুখে উঠল। বড় ভয় চিন্তার। দশজনকে ভয়, ছেলেকে ভয়, উৎসবের হাতে পান-সুপারি দিতে ভয়—ভরসা দিল শুধু উৎসব। বলল, তার কোনো দুষ্টচিন্তা নেই। চিন্তাকে সে বিয়ে করবে। কানে কাঁটি, গলায় পলাকাটি, হাতে নতুন খাড়ু দেবে। প্রথমে দশজন অনেক কথা বলবে। তাই গোপালকে রেখে তারা কলকাতা যাবে। কলকাতায় বিয়ে করবে। ফিরে আসবে দেশে। ঘরে পুরুষ না থাকলে চিন্তার সংসার চলবে কি করে? চিন্তা বলে—বাহা বসিবে যখন নিশ্চয় বলিল, তখন আমি স্বীকার গেলাম গো, মা। মু এমন পাতকী। তার পর উৎসব তাকে কলকাতা নিয়ে এল। দশজন চুরি করে নেবে বলে কাঁসা-পিতলের থালা-বাসন যা ছিল বেঁধে আনল চিন্তা। তারপর যা হ'ল তা যে কতকালের পুরোনো কথা সে চিন্তা জানেনা। তাই বার বার বলল—আমার সর্বনাশ করে পরধান পলাইল। না আমাকে বাহা করল, না কোনো গহনা দিল, মারিল ধরিল, টাকাগুলা নিল, তারপর এই দুটা বাচ্চা দিয়া পলাইল।

আজ সে ফিরে যেতে পারে না?—বলতে, চিন্তা বলে—আমার নিজের জমিতে ধান, পুকুরে ল্যাটা বেলে জাওল গজাড় মাছ—আমার কোন্ দুঃখ?

তবু যায়না কেন? —সেখানেই গলদ। এখন তার পাতকীর জন্যে তাকে দুশো টাকা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। গাঁয়ের দশজনকে ভাত-পিঠা খাওয়াতে হবে। তা ছাড়া এই মেয়ে-দুটোকে ত্যাগ করতে হবে। এত পরীক্ষা দিলে তবে তার সমাজ নেবে চিন্তাকে। —আমি কোথা থেকে টাকা পাব গো, মা? টাকাও পাবনা তাই দেশেও যাবনা।

আজ যারা এসেছে তারা তার দেশের মুরুব্বি। তার মামাশ্বশুর আর মামাতো দেওর। এতদিন ধরে ছেলেকে দেখেছে তারা। এখন এই ছেলের বিয়ের সময় হয়েছে। আর কত দায়িত্ব টানবে তারা? মেয়ে দুটোর ব্যবস্থা করে দেশে চলুক চিন্তা। প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা তবে জ্ঞাতিরা দেখবে। আমি বলি—তুমি তোমার ছেলে নিয়ে এখানে থাক না কেন? ছেলে কাজ করুক, তুমি কাজ কর। চলে যাবে।

মাথা নাড়ে চিন্তা। একে সে পাতকী। তাতে দশজনকে না মানলে তাকে কেউ মরলে কাঁধ দেবে না। ছেলেকে ত্যাগ করবে। সে চূড়ান্ত সর্বনাশের কথা কি ভাবতে পারে চিন্তা? পরলোক যে এর চেয়ে অন্ধকার হতে পারেনা তা চিন্তাকে বোঝাবে কে? সে শুধু বলে—মেয়ে দুটোকে কি করিব? আমার গিরি-গৌরীকে কি করিব?

দুটো টাকা ধার নিয়ে উঠে যায় চিন্তা। দই-মিষ্টি-মুড়কী এনে তার মামাশ্বশুরকে খাওয়াবে। চিন্তার হাতে ভাত তারা খাবেনা। যার কেউ নেই তার ভগবান আছে—এ কথা বলে যায় বটে চিন্তা, কিন্তু তার আপাত সমস্যার জট ছাড়াবে কোন ভগবান আমি ভেবে পাইনা।

মিষ্টি-মুড়কী খেয়ে চিন্তার ইহলোকের কাণ্ডারীরা বাপব্যাটায় আমারই রকের ছায়ায় ঘুমোতে আসে। চিন্তার ছেলেটাও দেখি পান খেয়ে তাস খেলতে বসল বামুনদের সঙ্গে।

সমস্যার সমাধান ভগবান নয়, মানুষই করে। বিংশশতাব্দীতে আমাদের চেনা রাস্তাগুলোর আশেপাশে অনেক কিছু চলে, যা পাপ। এবং তার বয়সও অনেক। চিন্তার ঘরে শুধুই বৈঠক বসে। দশজনে যুক্তি-পরামর্শ দেয়। টাকা ধার করে দশজনকে পান চা খাইয়ে মরে চিন্তা। ধূর্ত হেসে পানওয়ালাটা অশ্লীলভাবে ঘনিষ্ঠ হতে চায় চিন্তার সঙ্গে। চিন্তা যে একান্তভাবেই নিঃসম্বল

তা বুঝে তার মুখে পানের পিকের থুথুটা উথ্‌লে উথ্‌লে ওঠে। দুর্বার শরীর যৌবনের অভিশাপ নিয়ে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলে চিন্তা। পানওয়ালা আর চা-ওয়ালার দোকানে হেঁটে মরে। পানওয়ালার পয়সা আছে। বোকা এবং পাপের ভয়ে ভীত না হলে নিঃসন্দেহে চিন্তা এ সময়ে গুছিয়ে নিতে পারতো। রিক্সাওয়ালাদের মধ্যে কেউ কেউ মজা পায়। থেকে-থেকেই চেঁচিয়ে গান করে ওঠে।

পরদিন আমার ঝি টিউবওয়েলে জল ধরতে গিয়ে খবর আনে। কোমরের গুঁতোয় কলসী থেকে জল ফেলতে-ফেলতে আসে উত্তেজনায়। বলে—এমন পাপী মেয়েটা! বাচ্চা দুটোকে বিলিয়ে দিল? একটা জগুবাবুর বাজারের ওপারে—কিরকম মায়ের প্রাণ? ছি ছি ছি! চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে ঝি-চাকররা নিজেদের যে কতখানি ন্যায়ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত বোধ করছে তা বেশ বোঝা যায়।

বিলিয়ে তো দিল। কিন্তু নিল কে? গিরি-গৌরীর ছাল-ওঠা মুরগীর ছানার মতো চেহারার কথা মনে করি আর ঐ একটা প্রশ্নই মনে হয়। এত দয়া কার?

বিকেলে ইভ্‌নিং-ওয়াকে বেরিয়ে পাড়ার গার্জেনবুড়ো হনহন করে হেঁটে এসে পাশ ধরেন। বোঝা যায় কিছু একটা বলবার চাপা কৌতূহলে মুখচোখ তাঁর জ্বলজ্বল করছে। বলেন—শুনেছেন ব্যাপার? কিসের মধ্যে যে বাস করি!

এঁর মতো কৃতী ও বহুদর্শী লোককে এত মজা দিল কিসে, জানবার কৌতূহল আমার কম। কিন্তু তাঁর বলবার আগ্রহ দুর্দমনীয়। বলেন—কাল রাতে সে যা ব্যাপার! যাকে বলে কেচ্ছা। ঐ চিন্তা মেয়েটা, তার ব্যাপার সব জানেনই বোধ হয়—

উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করেন না। বলেন— তার দুটো জ্ঞাতি

না কে, কাল এসে বলে কিনা দশ, আট, আঠারো টাকায় ছ-জায়গায় ছটো মেয়েকে বেচেছে। আমাকে সই করতে বলে। আমি তো ভাগিয়ে দিলুম। ব্যাপার দেখেছেন? এসব নেয় কারা তা জানেন তো? নিলে ঐ দোসাদগুলো—তাদের বড় ব্যবসা এ সবের···তা আমি বলি—যা করেছো করেছো—এখান থেকে যদি না যাও তো পুলিশে খবর দিয়ে···তা যে পোঁ-দৌড় দিলে পুলিশের নাম শুনে!

ব'লে তিনি সিরিয়াস হয়ে ওঠেন। বলেন— দেখেছেন আমাদের অবস্থা? আপনাদের কোন চাড় নেই—পাড়া-বেসিসে যদি আপনারা সব সোশ্যাল-ওয়ার্ক করেন! ব'লে হনহন ক'রে হাঁটতে থাকেন কাস্টম্‌স-এর ভদ্রলোককে লক্ষ্য ক'রে। ঘটনাটার মজা ও রগড়ের দিকটা তাঁকে সুড়সুড়ি দিয়েছে।

সকালে চিন্তা বিদায় নিতে আসে। এবার আর একা নয়। ছুপাশে তার মুরুব্বিরা তার পোঁটলাটা নিয়ে চলেছে। ছেলেটাও যাচ্ছে টিনের স্যুটকেস হাতে। চিন্তার পরনে নতুন কাপড়, গায়ে জামা দেখি। কোন টাকায় কেনা, জিজ্ঞাসা করিনা। ভয় হয়। বিদায় নিতে এসে চিন্তা আর কাঁদে না। একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটলে পরে, যা নাকি তার ধারণার বাইরে, মানুষ যেমন হতভম্ব ও হতবাক হয়ে থাকে—চিন্তার মুখও তেমনই। মাঝে মাঝে পশুর মতো তাকায়। বোধ হয় দেখে, আমিও ওকে দোষী মনে করছি কিনা।

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে চিন্তা। বলে—তুমি বড় ভালো লোক গো, মা!

তার পরেই চলে যেতে পারতো, কিন্তু হঠাৎ চলে যায়না চিন্তা। জানলা দিয়ে ভুরু কুঁচকে যেদিকে দেখে—তাকে আকাশ নয়, অনির্দেশ কোনো দিশা বলা চলে। এখন চোখে পড়ে চিন্তার চোখছটো কালো, জোড়া ভুরুর মাঝেও উলকির টিপ আছে।

তাকিয়ে তাকিয়ে সেই চোখে জল আসে—নাক টানে চিন্তা—গরীবের ভগবান নাই গো, মা—গরীবের ভগবান নাই!

তার সঙ্গী ছু'টার চোখে ধূর্তামি উঁকি দেয়। গলাটা মোলায়েম ক'রে ছোকরাটা বলে— ওদিকে বাস পাবেনি গো!··· চিন্তার ছেলেটা দেখি বুড়োটার সঙ্গে কথা কাটছে—বাস, ট্রেন, জলখাই দশটাকার মামলা—আমার টাকা-তিনের জামা কেনে কিনিলি?

—হব, হব—ব'লে ভরসা দেয় বুড়োটা। অর্থাৎ সেই আঠারো টাকা থেকেই হবে।

যার ভগবান নাই, তার কেউ নাই—এই শেষ কথা বলে চলে যায় চিন্তা। রাস্তাটা পেরোয়। দু পাশে দুটো লোক চলে। ছেলেটা বুড়োটার হাত ধরে চলে। এবার তার বিয়ে হবে। কন্যাপক্ষ যে টাকা দেবে, তার থেকেই প্রায়শ্চিত্ত, বা এ-টাকার থেকে ও-টাকা মিলেঝুলে জোড়া-তালি দিয়ে যা-হয় একটা হয়ে যাবে চিন্তার কপালে—এই নিয়ে চিন্তা ছাড়া আর তিনজন আলোচনা করে। চিন্তা আস্তে আস্তে হাঁটে। এপাশে ওপাশে তাকিয়ে রাস্তা পেরোয়। প্রায় দৌড়ে ওই-ফুটে ওঠে। তার পর আর তাকে দেখিনা।

ছায়াবাজি

মাঝরাতে দরজায় ঘা পড়লো। মধ্য প্রদেশের যে জায়গাটায় এসেছি সেখানে চেনা মানুষ নেই। ষ্টেশনের কাছে একটি ছোট বাড়ী নিয়ে আছি। হাওয়া বদলের জন্যে এসে জায়গাটাকে ভালোবেসে ফেললাম। পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনার একটি শিল্প-কেন্দ্রের উপান্ত অঞ্চল। অনতিদূরে শহরের সব সুবিধেই অপেক্ষমান। এই নির্জনতায় স্বেচ্ছাকৃত আত্মনির্বাসনের পেছনে আছে শুধু একটু শান্তিতে থাকবার কামনা।

কেউ চেনে না জানে না। তাই আমার নাম ধ'রে ডাক শুনে অবাক হলাম। আধিভৌতিক কিছু নয়। কেন না বিপন্ন কণ্ঠে ডাকছে একজন। পেছনে সাত আটজন দাঁড়িয়ে।

দরজা খুলতে যে ঢুকলো তাকে দেখবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বিজয়ের ভাই কুমুদ। চুল উস্‌কোখুস্‌কো। বিভ্রান্ত, আতংকিত চেহারা। দু'বছর আগে শেষ দেখেছি তাকে ডালহৌসিতে। বিকেল পাঁচটার জনারণ্যে। কোথা থেকে ঠিকানা জানল কুমুদ, কি ব্যাপার—কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো কুমুদ। বললো—

—শীগ্‌গির ষ্টেশানে চলো বাদলদা, দাদা স্যুইসাইড করেছে।

স্যুইসাইড করেছে বিজয়? আমার কোন প্রশ্নকে মুখর হতে দিল না কুমুদ। বললো—

—সব পরে শুনবে বাদলদা। এখন চলো।

গেলাম। ছোট্ট ষ্টেশান। এই সময় বম্বে-মেল পাস করে আর ফোরটিন-আপ স্লো করে মোশান। তাই চড়া আলোটা

জ্বলেছে। সেই আলোর নিচে ষ্টেশান মাষ্টার আর কয়জন কুলী দাঁড়িয়ে আছে। প্লাটফর্মে শুয়ে আছে বিজয়। ছয়ফিট তিনইঞ্চি চমৎকার শরীরটা, যা নিয়ে বিজয় চিরদিন মাথা উঁচু করে চলে ফিরে বেড়িয়েছে—আজ সেই দেহটাই অসহায় ভঙ্গীতে পড়ে আছে দেখে মনে ধাক্কা লাগল। কাঁচাপাকা চুল ভরা মাথাটা বিশ্রী একটা কোণ সৃষ্টি করে হেলে আছে। একখানা হাত কপালে ঢাকা দেওয়া। সেই হাতের আঙ্গুলের মধ্যে এমন অসহায় কিছু একটা দেখলাম আমি, একটা মিনতির ভাব, অথবা পরাজয়ের ভঙ্গী,—যা বিজয়ের সারাজীবনের বহু আশাভঙ্গের প্রতীক। দেখে পা কাঁপতে লাগল আমার। ষ্টেশান মাষ্টারের বিবেচনা আছে। কম্বল ঢাকা দিয়ে রেখেছেন বাকিটুকু।

এমন রাত যেন কারো জীবনে না আসে। থানাপুলিশ ডাক্তারের হাঙ্গামা মিটিয়ে ছোট ঝর্ণার ধারে নিয়ে বিজয়কে দাহ করবার ব্যবস্থা করতে পরদিনের সন্ধে গড়ালো। কুমুদকে সান্ত্বনা দেবার ভার নিয়েছিলো আমার স্ত্রী। তিনদিন বাদে কলকাতায় ফেরবার সময় হলে তাকে গাড়ীতে তুলে দেবার কাজটুকুও আমিই সারলাম। অনেক তুঃখের মধ্যেও মনে হলো কুমুদ যেন মুক্তি পেলো। এমনি একটা ভাব। গাড়ী ছাড়বার আগে করুণ হেসে কুমুদ বললো—

—কি জানো বাদলদা, শেষ অবধি দাদাও বেঁচে গেল। ও জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা তার পক্ষে······

একটা মানুষ কেমন করে যে মুছে যায় পৃথিবী থেকে, ভাবলে অবাক লাগে। হয়তো জীবনের নিয়মই এই। অপ্রয়োজনীয় যা তাকে নির্মম হয়েই পরিহার করতে হবে। তাই বিজয়ের মৃত্যুতে এতটুকু নাড়াচাড়া পড়লো না। পরিচিতজন মুখে বিস্ময় আর সহানুভূতি জানালেন। কোন শোকসভা হলো না। হৈ চৈ পড়লো না। কাগজে কালো লাইন টেনে কোন সংবাদ জানানো

হলো না। দুর্ঘটনা শীর্ষক সংবাদ বেরুল—ট্রেণ হইতে লাফাইয়া জনৈক বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তির……'

নিজেকে ছাড়িয়ে চাঁদসূর্যও চোখে দেখত না বিজয়। সে জানতো এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে তারই জন্যে। চমকপ্রদ মৃত্যু বরণ করে দুনিয়াটাকে চমকে দেবার একটা ইচ্ছে তার অন্তরের অন্তস্থলে খেলা করেছিলো না কি সেই সময় তাও জানি না। সে দুনিয়াকে ছাড়বার অনেক আগেই দুনিয়া তাকে ছেড়েছিলো। তাই কোন ছাপই রেখে যেতে পারলো না বিজয়। বাতাসের মুখে ছেঁড়া কাগজের মতোই বাতিল হয়ে গেল।

বিজয়ের ট্র্যাজেডি কিন্তু সুরু হয়েছিলো সুদূর কৈশোরে। গরীব বাপের মেধাবী ছেলে বিজয়। ছোট ভাইবোনদের বঞ্চিত করে সরটুকু, ঘি-টুকু বিজয়কে খাওয়াতেন মা। দুনিয়াটাই যে তার জন্য, এ ধারণার অঙ্কুরও সেদিনই তার মনে সৃষ্ট হয়। বিজয় ভালো জামা কাপড় পরতো, ভালো স্কুলে পড়তো। গরীব বলে পরিচয় দিয়ে ফ্রি-শিপ অথবা বইপত্রের সাহায্য নিতে বাধতো তার।

পনেরো বছর বয়সেই মাথায় সাড়ে পাঁচ ফিট লম্বা হলো বিজয়। সব দিক থেকে তারিফ করবার মতো চেহারা। ইন্‌স্পেক্টর এলে তাকেই কবিতা বলবার জন্যে ঠেলে দেওয়া হয়। প্রাইজ দিতে গিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট-গিন্নী তার সঙ্গেই কথা বলেন। বিসর্জন নাটকে সে-ই সাজে রাজা।

নিজের সম্পর্কে বিজয়ের আস্তে আস্তে উচ্চ ধারণা হলো। সে প্রিয় ছিলো তার মিষ্টি স্বভাবের জন্য। এখন তার মধ্যে এলো উন্নাসিকতা। ব্যবহারে এলো দম্ভ এবং তাচ্ছিল্য। মাষ্টাররা তার এই পরিবর্তন দেখে তার সম্পর্কে অসন্তুষ্ট হলেন। বিজয়ের বাবাকে যাঁরা জানতেন তাঁরা গোপালবাবুর ভবিষ্যৎ ভেবে দুঃখিত

হলেন। যার ছেলে বাপের দুঃখ বোঝে না, সে বাপের জীবনে আর কি রইলো!

আমরা প্রথমটা হাসাহাসি সুরু করলাম। ক্লাসে যেখানে নেস্‌ফিল্ডের গ্রামার পাঠ্য, বিজয় সেখানে আই-এ'র ইতিহাস বই নিয়ে ক্লাসে বসে থাকে। মাষ্টাররা পাঠ্য বিষয়ে জবাব চেয়ে পান না। অথচ যখন তখন সে এমন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করে, যার জবাব তাঁদের মুখেও জোগায় না। ক্লাস টেন-এর ছেলে পাঠ্য বই না পড়ে এলিয়ট নিয়ে কেন মাথা ঘামাচ্ছে, এ প্রশ্ন তাঁদের মনে স্বতঃই উদিত হয়।

ছেলেরা তাকে চালিয়াৎ ডাকতে সুরু করলো। আমি, প্রণব, অনাদি, অরুণ, দিলীপ—আমরা সত্যিই বিশ্বাস করেছি বিজয়কে। বিশ্বাস করেছি সে এতবড় একটা প্রতিভা, যা এদেশে দুর্লভ। সমসাময়িক কালে যে প্রতিভার সমাদর হয় না, সে সম্পর্কে বিজয়ই স্বদেশ-বিদেশের অনেক মানুষের উপমা টেনে এনে বুঝিয়েছে আমাদের।

আমাদের মর্মাহত করে বিজয় টেষ্টে খারাপ রেজাল্ট করলো। তার বাবা রাগারাগি করলেন। মা কাঁদলেন। তার পরে-ও বাবা পরীক্ষার ফি জোগাড়ের চেষ্টায় বেরুলেন। আমাদের বিজয় বললে—

—টেষ্টটা দেখে ঘাবড়াস না। দেখিস—ফাইনালে টেনে বেরিয়ে যাবো।

কিন্তু যত সামান্য হোক, ম্যাট্রিক একটা পরীক্ষা। তার জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন। বিজয়ের গগনবিহারী মন সূতোগুটিয়ে এসে আকবর, শেরশাহ, আর অষ্ট্রেলিয়ার কৃষিসম্পদ নিয়ে ভাবতে চাইল না। পাটিগণিতে গজ ফুট মেপে তেলমাখানো লাঠিতে যে বাঁদরটা উঠছে আর নামছে তার গতিবিধি সম্পর্কে আগ্রহটা জাগাতে পারলো না। ফলে দ্বিতীয় বিভাগে মোটামুটি পাশ করলো বিজয়। রাতারাতি চলে এলো কলকাতা।

কলকাতায় কলেজ-জীবন শেষ হতে না হতে বিজয়ের ধারণা হলো সে সবরকমে অসাধারণ। কোন দিক দিয়ে স্ফুরিত হবে তার প্রতিভা? আমরা বারবার জানতে চেয়েছি। প্রণব বলেছে—

—একটা এমন কিছু কর বিজয়, যাতে—!

স্বল্প হেসে চুপ করেছে বিজয়। সবাইকে পেছনে রেখে এগিয়ে যাবে, চমকপ্রদ কিছু করবে সে, এই তার পণ। জীবন নিয়ে এ রকম পণ ফেলতে কেউ জোর করেনি তাকে। নিজের সঙ্গে নিজেই বাজি ফেলল বিজয়। ফলে তার অবস্থা দাঁড়ালো কোনো হতভাগ্য রেসের ঘোড়ার মতো। রেস তার সারা জীবনে-ও শেষ হয় নি। এ রেসের আদি ছিল। কিন্তু বিজয়ের মৃত্যু পর্যন্ত তার অন্ত ছিল না।

সাধারণ ছেলে আমরা। সাধারণ রুচি আমাদের। কলেজে আমরা অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশে সিনেমা দেখেছি। খেলাধূলা করেছি, মেয়েদের পেছনে লেগেছি, আবার ছাত্র আন্দোলন নিয়ে গলা ফাটিয়ে মাইকে বক্তৃতা দিয়ে ইউনিভার্সিটির দেয়ালে পোষ্টার সেঁটেছি।

আমাদের মধ্যে পাব বিজয়কে? ইংরেজির ছাত্র বিজয়। কিন্তু সবিতা রায় দুষ্টুমি করে জানিয়ে গেল—ফিলজফির ছাত্র-ছাত্রীরা রেফারেন্সের বই পায় না। বিজয় সব বই নিয়ে বসে আছে।

প্রোফেসর লেকচারাররা বিজয়কে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন। ছেলেরা যা বললো, তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমরা উপহাসাস্পদ হলাম। মেয়েদের মনে স্বতঃই জাগল কৌতূহল।

নরমসরম সুশ্রী একটি লাজুক মেয়ে। মাধবী নাম তার। বিজয়ের সমস্ত উন্নাসিকতাকে সে প্রতিভার স্বাভাবিক রূপ মনে করলো। তার শ্রদ্ধা গিয়ে দাঁড়ালো অনুরাগে। কলেজ সোস্যালে

গান করে নাম করেছে অরুণ—অরুণ মজুমদার নাম করা গাইয়ে। অরুণ মাধবীকে সত্যিই ভালবেসেছিলো। আমি বিজয়কে বললাম—

—তুমি ত' কোন খবরই রাখ না। এদিকে মর্তলোকে যে বিপ্লব বাধলো। অরুণের কথা ভেবে দেখেছ? মাধবীর সম্বন্ধে ঠিক করো একটা কিছু!

অরুণের প্রশ্ন নয়। মাধবী যে তাকে ভালবাসতে সাহস করেছে তাতেই বিরক্ত হলো বিজয়। তাদের বাড়ীর ছাদের ঘরের নিচু ল্যাম্পটার আলোতে বিজয়কে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। ফর্সা রঙ। সুশ্রী চেহারা। রুক্ষ চুল। চওড়া কপাল। ছয়ফিট তিন ইঞ্চি শরীরটা নিয়ে বসে থাকলেও অনেক উঁচু দেখায়। তবু সেদিন বিজয়কে ভালো লাগলো না আমার। মনে বিদ্রোহ জাগলো। আবার বাল্যের বিশ্বস্ততাই জয়ী হলো। মাধবীর জন্যে কষ্ট হলো। একেই বোধ হয় বলে 'পতঙ্গের ব্যর্থ প্রেম নক্ষত্রের লাগি।' অরুণকে পরদিন বলে এলাম—নির্ভয়ে এগিয়ে যা।

অরুণ মাধবীকে কিছু বলেছিলো কিনা জানি না। অরুণের যা স্বভাব, হয়তো বা গুটিয়েই নিল নিজেকে। বিজয় মাধবীর সম্পর্কে রূঢ়ভাবে উদাসীন হয়ে উঠলো। মাধবীর মনোযোগে সে নিঃসন্দেহে খুসী হয়েছিলো মনে মনে। তাই উপেক্ষা-ও করলো দশজনকে জানিয়ে।

এই ত্রিভুজের সম্পর্কে ইউনিভার্সিটি মুখর হলো? অরুণ মাধবীকে ভালবাসে, মাধবী চায় বিজয়ের প্রেম আর বিজয় নিজেকে ছাড়া কারুকে চায় না। 'নার্সিসাস ও মাধবিকা' নামে একটি ইঙ্গিতপূর্ণ কবিতা লিখে ফেললো একজন।

শেষ অবধি দো-টানায় পড়ে অনেক ভেবে মাধবী উপযাচিকা হয়ে গেল বিজয়ের কাছে। বললো—বিজয়, আজ এ কথা আমার বলবার নয়—তবু আমিই বলছি!

অরুণের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব শুনে বিজয় জানালো তার কোন আগ্রহই নেই। কলকাতায় রোজ অজস্র বিয়ে হয়। সে সব কিছু খোঁজ রাখতে যায় না। তবু মাধবী মরিয়া হয়ে আরো নির্লাজ হলো। বললো—

—তবু-ও ত' সব কথা বলা হলো না বিজয়! আমি ত' এ বিয়ে চাই না। তোমার কথা পেলে—বিজয় অত্যন্ত বিস্মিত হলো। বললো—

—তোমার সঙ্গে পরিচয় আছে এই মাত্র। তার বাইরে তোমার সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ-ই নেই।—জানালো তার মতে মেয়েরা হচ্ছে শুধুই জন্মদানের এক একটি সামাজিক প্রয়োজন। তার বাইরে মেয়েদের সত্তা আছে? হাস্তকর কথা!

—ভগবান করুন বিজয়, এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রতিদান তুমি পাও!

ব'লে ছাইমুখ ক'রে ছুটে বেরিয়ে গেল মাধবী।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুবার পর বিজয় দাসকে ঘিরে একটি উন্নাসিক ভক্তমণ্ডলী গড়ে উঠলো। তাদেরই একজনের বালিগঞ্জের বাড়ীতে কাচঘরে বসলো তাদের 'সিলেক্ট'-এর অধিবেশন। মাসে মাসে সেখানে সন্ধ্যে বেলা জমতে লাগলো কিছু বাছাই করা নরনারী। সেই উন্নাসিক মণ্ডলীর পুরুষ-মেয়েরা বিজয় দাসদের নাম শুনে থাকে। সাক্ষাৎ পরিচয় হয় না। মধ্যবিত্ত সেখানে প্রবেশের ছাড়পত্র পায়নি।

বিজয়ের দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, অতি সহজে সবাইকে উপেক্ষা করবার অভ্যাস, এই সব দেখে ঝুঁকলেন বিবলি বোস, বুলা রায়, পিক্‌পিক্ সোম প্রমুখ বিবাহিতা অবিবাহিতা মহিলারা। তাঁরা যে স্তর থেকে এসেছেন, সেখানে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি জীবন খানা সুবৃহৎ রূপোর চামচের বুকে নিরাপত্তার আবাসে অটল। সেখানে ভালো নামে ডাকবার রেওয়াজ নেই! তাই বাংলার

শিল্পপতিদের অন্যতম মাঙ্গবর অমুককে এইখানে দেখে প্রখ্যাত ডাক্তারের বৌ পিক্‌পিক্‌ সোম স্বচ্ছন্দে রুমালের টোকা মেরে—বুবলু, তুমি কি দুষ্টু হয়েছো! ব'লে আঁকা ভুরু কাঁপালেন। স্বামী অজয় রায়ের গাড়ী, বাড়ী, সুদর্শন কান্তি দেখে দেখে ক্লান্ত লতিকা রায় বিজয়ের পাশে গিয়ে বললেন—মনের দোসর পেলাম না।

বিজয়ের সম্পর্কে বান্ধবী রুমা তালুকদারকে বললেন—এমন রুখা ভুখা ইণ্টারেষ্টিং চেহারা! আমি ওকে আমাকে বুলা বলেই ডাকতে বলেছি।

ঐশ্বর্যের আফিসে জীবনে বাঁচবার আনন্দ যাদের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত, সেই সব মানুষ সহসা বিজয়কে দেখে উৎসাহিত হলো। সকলেই বললো—পেয়েছি একটা প্রতিভা।

আশ্চর্য কি, যে অর্থকুলীন সমাজের এই সব বত্রিশ পুতুলের মুখে স্তুতিবাদ শুনে বিজয়ের ধারণা হলো সত্যিই সে অসাধারণ?

এই সময় মারা গেলেন বিজয়ের বাবা। বিধবা মা ছোট ভাইবোনদের মুখ চেয়ে বিজয়কে বললেন—তুই একটা চাকরী দেখে নে। সংসার ত' আর চলে না।

ছোটভাই কুমুদ আর সুজয় বললো—দাদা, অরুণ সোম এতবড় একটা লোক, খাস বিলাতী কোম্পানীর ডিরেক্টর! ওঁকে বললেই তোমাকে একটা বড় চাকরী দেবেন।

পিক্‌পিক্‌ সোমকে সে এখন ক্যামাক্‌ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বসে চীনে ছবি দেখতে শেখাচ্ছে। ঠিক আলোতে ছবিটি রেখে, তারা দু'জন কোলে হাত রেখে চীনে ধূপের ধোঁয়ায় বসে থাকে। পিক্‌পিকের দেওর অরুণ। অরুণকে সে চাকরীর কথা বলবে? ছিঃ!

সোমের বাগানে রঙীন ছাতার তলে বসে সাদা খরগোসকে কাজুবাদাম খাওয়াতে খাওয়াতে বিজয় পিক্‌পিকের কাছে মধ্যবিত্ত

মা-দের ট্র্যাজেডির কথা সুন্দর ভাষায় বললো। বললো—আমাকে ওরা কাজ করতে বলে। আমি কাজ করছি ভাবতে পারো?

পিক্‌পিকের টানা টানা চোখ যেন মূর্চ্ছা গেল। এমনি করেই এলিয়ে পড়লো। বিজয় বললো—

—আমার ভাইরা কাজ করুক। আমি বিজয় দাস···আমার সঙ্গে বাস করে ওরা, তাই তো একটা ভাগ্যের কথা!

শেষ অবধি কুমুদ আর সুজয় চাকরী নিলো। বিজয় নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের এক দুরূহ তত্ত্ব নিয়ে মস্তো বই লিখলো রাতজেগে বসে। বিজয়কে দেখবার পর বিশ্বাস করতে সুরু করেছিলো লতিকা রায়, যে বিবাহিত জীবনে সে অসুখী। বিজয়ের মধ্যে সে নিজের প্রাণমনের একটা দোসর পেয়েছিলো। লতিকা-ই টাকা দিয়ে বই ছাপালো বিজয়ের। 'সিলেক্ট'-এর স্তাবকবৃন্দের আর বুঝতে বাকি রইলো না, যে এবার বিজয়ের পায়ের কাছে দেশবাসীর হৃদয়মন ঢেলে শ্রদ্ধাঞ্জলি পড়বে।

কার্যকালে তা মোটেও হলো না। কেমন করে যেন টিপ ফস্কে গেল। সমালোচনার ভার স্বতঃই বিজ্ঞানীদের হাতে পড়লো। তাঁরা কড়া ভাষায় লিখলেন—কোন বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান না রেখে······

স্তাবকরা কিন্তু সমালোচকদের কথাবার্তা উড়িয়ে দিল। সেই কাচের ঘরে বিজয়কে তারা অভিনন্দন জানালো। পার্টিতে যে খরচ হলো,—তাতে স্বচ্ছন্দে বিজয়কে বসিয়ে ও রকম আরো পাঁচখানা বই পাঁচবছর ধরে লেখানো চলতো।

তাতেই খুসী হবে বিজয়? অন্য একটা পথ খুঁজতে লাগলো সে। মনে হলো ভারতীয় সঙ্গীতের উৎপত্তি নিয়ে অনেক কিছু করবার আছে। আমাদের বন্ধু অরুণ মজুমদার তখন বাইরে গাইতে সুরু করেছে। অরুণ বললো—বিজয়, গান তুই কোনকালে-ও করিসনি। ও খেলা করবার জিনিস নয় বিজয়।

—গলায় গান গাইবার কথা কে বলছে? তোদের মতো মেয়ে ভোলানো গানের কথা আমি বলছি না। গান এলো কোথা থেকে? আর্য-অনার্য সভ্যতার মিশ্রণ আর আরব পারস্যের প্রভাব—

—এ বিষয়ে-ও পশ্চিমের বহু পণ্ডিত, আমাদের দেশের বহু জন, গভীর গবেষণা করেছেন।

অপরে যা করেছে তার ওপর বিজয়ের অসীম অশ্রদ্ধা। অরুণের সঙ্গে নেমে আসছি যখন, দেখলাম বিজয়ের মা আগুন তাতে বসে রুটি ভাজছেন। তার বোন বেলা বাটনা বাটছে। কুমুদ আর সুজয় খেতে বসেছে। খুব ভদ্রভাবে গরীব হয়ে যাচ্ছে পরিবারটি। বেলার সুন্দর চেহারাটা সতেরো বছরেই স্বাস্থ্যের অভাবে ফ্যাকাশে হয়েছে।

বেরিয়ে রাস্তায় এসে অরুণ আমার মনের কথাটা বললো। বললো—বিজয়টা একেবারে অমানুষ।

গান ছেড়ে সাহিত্যের বুড়ী ছুঁয়ে বিজয় ছবি আঁকতে ধরলো কবে সে খবর ঠিক জানি না।

হঠাৎ একদিন প্রতীপ দত্তের সঙ্গে দেখা। বলল—আপনাদের সেই জিনিয়াসকে নিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়েছি। বিজয় দাসের মা, সম্পর্কে আমার পিসীমা। তাঁর অনুরোধে এতদিন বাদে একটা চাকরী করে দিতে পারলাম বিজয় দাসকে। পাবলিসিটি ফার্মের কাজ। কে লুফে নেবে না বলুন! তা সে দু'দিন ধরে আসছে না। আজ ফোন করে জানিয়েছে চাকরী করবে সে নিজের সর্ত অনুযায়ী। তাকে সম্মান দিতে হবে!

অত্যন্ত রাগ হলো। প্রতীপ দত্তের মোটা চৌকো মুখখানা দেখে বুঝতে বাকি রইল না বিজয় দাসের সম্মানের দাবীটা তার বোধের অতীত। বিজয়ের ওপর রাগ হলো। কেন, সে কথা আর কি বলি।

বিজয়ের বাড়ীর চেহারাটা আরো মলিন। কি ভাগ্য যে

বেলার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। দুই ভাই সংসার চালাচ্ছে। বিজয়ের মা ছেলের নাম করতে অভিশাপ দিয়ে উঠলেন।

ঘরের মেঝে ভরা সিগারেটের টুকরো। চায়ের পেয়ালায় সর। ইজেল পর্দা ঢাকা। প্যালেটে চাপ চাপ রঙ। তুলি গড়াগড়ি যাচ্ছে।

বিজয়ের চোখের চাহনি যেন কেমন দেখলাম। বসলাম। চোখ বুঁজে নিজের কথাই বলে গেল বিজয়। কোন্ ক্রিটিক কি বলেছেন। কার কথার মূল্য কতখানি। শুনতে শুনতে অসহ্য বোধ হলো। বললাম—

—বন্ধুবান্ধবের খবর রাখিস ?

—না।

—প্রণবকে মনে পড়ে ?—লণ্ডনের ডক্টরেট পেলো প্রণব। ওর পেপারের খুব প্রশংসা বেরিয়েছে। দেখিস্ নি ? বিজয় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। বললাম—

—আর কারু খবর রাখ আর না রাখ, অরুণের খবর নিশ্চয় জানো ? ডেলিগেশনে হরদম বাইরে যাচ্ছে। লণ্ডনে ক্লাসিকাল গানের প্রোগ্রাম করলো। খুব নাম করেছে। এক ডাকে চেনে সবাই। ভালো কথা, অনাদি—

—অনাদি আবার কি করলো ?

বিজয়ের অসহিষ্ণু কণ্ঠ আমি যেন শুনেও শুনলাম না। বললাম—

—অনাদি সাউথে যাচ্ছে আর্ট কলেজে চাকরী নিয়ে। ওর তিনখানা ছবি সেন্ট্রাল থেকে কিনলো দিল্লীতে আর্ট গ্যালারীর জন্যে। কেন, ওর ছবি নিয়ে এবারকার ক্যালেণ্ডার দেখিস্‌নি ?

বিজয়ের গলার স্বরটা কেমন যেন হয়ে গেল। আমার মুখের দিকে চোখটা তুলে বললো—

—অনাদি ছবি আঁকত, তাই না ?

—এই শোন্, অনাদিকে আমরা একটা রিসেপ্‌শন দিচ্ছি।

কোথায় জানিস? তোদের সেই 'সিলেক্ট'-এ। সেই কাচঘর। মনে আছে তো?

—সেখানে?

—দিলীপ যে ওবাড়ীর মেয়ে রঞ্জনাকে বিয়ে করেছে। দিলীপ-ই ব্যবস্থা করছে। কেন অনাদির খবর তুই জানিস না?

—না।

—কাগজ পড়িস না?

—কোন্ শিক্ষিত লোক কাগজ পড়ে বলো? —আমি হাসলাম। বিজয় চটে উঠল। অস্থির হয়ে উঠল তার লম্বা লম্বা ফর্সা আঙুলগুলো। বেতের চেয়ারের উপর লক্ষ্যহারা ভাবে চলাফেরা সুরু করলো। বললাম—

—তুমি যা-ই বলো বিজয়। আমাদের মধ্যে তুমি-ই ছিলে সবচেয়ে গুণী। অনাদি, অরুণ, প্রণব, এদের তুমি কি রকম তাচ্ছিল্য করতে। দেখ, প্রমাণ হলো ত' প্রতিভাকে কাজে লাগাতে হয়! পরিশ্রম করতে হয়!

কোন একটা নিষ্ঠুরতা পেয়ে বসেছিল আমাকে। বললাম—

—তুমি একটা কিছু কর বিজয়! প্রতিভা মানে এ-ই নয় যে ঘরে বসে বসে তুমি সকলের ওপরে থাকবে, আর তোমাকে বুঝলো না বলে দেশের মানুষ হচ্ছে বোকা।

তারপর-ই নিজের রূঢ় আচরণ লজ্জা দিলো আমাকে। বেরিয়ে এলাম আমি। বিজয়ের মা-কে দেখলাম তরকারী কাটছেন, রান্নাঘরে বসে বসে। বিড়বিড় করে কথা বলে চলেছেন। একটা বিশ্রী কৌতূহল থেকে দাঁড়ালাম এক মিনিট। তিনি শাপ দিচ্ছেন নিজের ভাগ্যকে। স্বামীকে দোষ দিচ্ছেন। বিজয়কে শাপ দিয়ে চলেছেন।

বিজয়ের বাবার কথা মনে পড়লো। মনে হলো অনেক সুকৃতি তাঁর। মরে বেঁচেছেন!

আমি চলে আসবার পর আমার কথাগুলো নিশ্চয় ভেবেছিলো বিজয়। অন্য সকলের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের জীবনের চূড়ান্ত বিফলতা তাকে আতঙ্কিত করেছিলো কি? কে জানে?

তার-ও পরে চারটে বছর গেল। ছবি আঁকবার ক্যানভাস ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে বিজয় থিয়েটারের দিকে ঝুঁকলো। কিন্তু কঠিন হয়ে আসছে দিনকাল। যে প্রতিভার কোন পরিচয়-ই পাওয়া যাচ্ছে না, তার পেছনে অনির্দিষ্ট কাল ধরে স্তুতিবাদ চালাতে নারাজ মানুষ। তাছাড়া চল্লিশ বছর বয়সে-ও যে মানুষ এটা ছেড়ে ওটা ঠুকে ঠুকে নিজের পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা করছে, তাকে বোঝা কঠিন। তাকে ভালোলাগা কঠিনতর।

থিয়েটারের ট্রুপ ভেঙে কার যেন টাকা নিয়ে এক মাসিক-পত্রিকা খুললো বিজয়। প্রথম এবং সর্বাগ্রগণ্য হবার পাগলামি-ই তার শত্রু হলো। নইলে এত জিনিস হাতড়িয়েছে বিজয় সারা জীবন ধরে যে মাঝামাঝি একরকম দাঁড়িয়ে যেতে পারতো যে কোন একটায়। ঘষেমেজে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পৌঁছতে পারলে অর্থাগম-ও হতো। তার কোনটাই হলো না। সেই দীর্ঘছন্দ দেহ পাকিয়ে উঠলো। চোখের নিচে পড়লো কালি। বন্ধুবান্ধব তাকে দেখলেই সরে পড়তো। কথাবার্তায় সেই দম্ভ এবং আত্মম্ভরিতা তখনো তার অটুট। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

বিজয় দাসকে তখনো দেখা গিয়েছে, মাথা উঁচু করে চাদর লুটিয়ে কলেজ ষ্ট্রীটে হাঁটতে, অথবা বিদেশী ছবির এক্‌জিবিশনে ডেনমার্কের প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ করতে। তার বহির্জগৎ তখনি সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে। তার ভক্ত মহল অনেক দিন হলো তাকে পরিহার করে নতুন প্রতিভার সন্ধানে ব্যস্ত। বিদ্বৎ সমাজ তাকে সন্দেহের চোখে দেখে। কেননা সর্বঘটের কাঁঠালী-কলার ওপর তাদের অনাস্থা অসীম।

ঘর তার কাছে অসহ্য। বাড়ীর তাকভরা তার লেখা বইগুলো

পোকায় কাটছে। দেওয়ালে অনাদৃত সব ছবি। মিউজিকের বইগুলোতে ধুলো পড়ছে। মা তাকে সহ্য করতে পারেন না। ভাইরা ভয় পায়। কেন না তার সঙ্গে তাদের মানসিক দূরত্ব হাজার হাজার মাইলের-ও বেশী। ঘরে বাইরে নিজের দম্ভ আর অজস্র হতাশার বোঝা নিয়ে এই সঙ্গীহীন মানুষটি মাথা উঁচু করেই ফিরতে লাগলো। নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় একলা ছাদের ঘরে বসে থাকতো যখন বিজয় তখন দেওয়াল থেকে পনেরো বছরের বিজয় দাসের সুখী, হাসি খুসী চেহারাটা তাকে ব্যঙ্গ করতো।

শেষ অবধি ছোট্ট একটা ঘটনা তাকে চূরমার করে ভাঙ্গলো। তারই পরিচিত ছেলে তপন আর স্বাতী যখন প্রেম করে বিয়ে করলো, কথা উঠলো। স্বামীর ঘর ছেড়ে আসতে স্বাতীর মানসিক প্রস্তুতির অভাব ছিলো না। কিন্তু জবরদস্ত পুরোন সিভিলিয়ান জোয়ার্দার সাহেব স্বাতীকে বেঁধে ছিলেন আইনের মারপ্যাঁচে। বিয়ে করবার আগে আট বছর অপেক্ষা করতে হলো তপনকে। স্বভাব-সুলভ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বিজয় ধাক্কা খেলো তপনেরই ছোট ভাই-এর কাছ থেকে। শুনলো— এখনো যদি বিয়ে না করো বিজয়দা, এ্যাসাইলামে যেতে হবে।

অনেক কথাই মনে হলো বিজয়ের। মনে হলো বয়স তার তেতাল্লিশ। বুঝলো জীবনটা তার কাছে কত বড়ো ফাঁকি। একলা ঘরে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের ছয়ফিট তিনইঞ্চি ছায়াটা দেখে ভয় হলো তার। তার চেয়ে যেন তার ছায়াটা অনেক জীর। তার রক্তমাংসের শরীরটাকে হারিয়ে দিয়ে ঐ কালো নিরবয়ব ছায়াটা কেবলি লাফ দিয়ে উঠতে চায়। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো বিজয়। মনে হলো অনেকদিন আগে, বোধ হয় দশবছর আগে-ও মা তাকে বিয়ের কথা বলতেন! ঘুরতে ঘুরতে বিজয় গেল লতিকা রায়ের বাড়ী। একদা বিবাহিত জীবনে অসুখী বলে বিজয়ের

দিকে ঝুঁকেছিলেন লতিকা রায়। এখন তাঁর জীবন পরিপূর্ণ। যে বিজয়কে দেখে তাঁর মনে হয়েছিলো ডাক্তার অজয় রায় মানুষ হিসেবে অনেক ফ্যাকাশে, আজকের বিজয়ের মধ্যে তাকে খুঁজে পেলেন না লতিকা। বিজয়ের আধাময়লা জামাকাপড়, চোখের অস্থির দৃষ্টি, ধূলোভরা চটি দেখে লতিকার ভ্রূ উঠে গেল বিরক্তিতে। হাল্কাবাদামী টেম্পেরা করা ঘরে, যামিনী রায়ের ছবি আর নাগাদের বেতের টুপি, তীর ধনুক সাজিয়ে যারা বাস করে, তাদের মনের ভাব মুখে প্রকাশ পায় না। তাই লতিকা রায় অল্প হাসলেন। বললেন—

—আপনাকে 'সিলেকট্'-এ দেখতাম না? আপনি ত' বিজয়বাবু? আপনার মুখে সেই 'আরাগঁ'র কবিতা! ডোডো—! বুব্‌লা—!

সি. এল. টি'র হাল্কা হলদে আর সবুজের পোষাকে ছুটি সুন্দর মেয়ে নাচতে নাচতে এলো স্কিপিং দড়ি হাতে। লতিকা বললেন—

—গাড়ী বের করেছে? আমার ব্যাগটা নামিয়ে আনো!

তারপর বিজয়ের দিকে চোখ তুললেন। বললেন—

—এখন কি করছেন?

বিজয়ের অসম্ভব হাসি পেলো। সোডার মতো দুর্দম হয়ে হাসি উঠে এলো। বললো—

—একদা আমাকে তুমি বলতে লতিকা! ডোডোকে আয়ার কাছে রেখে একদিন আমার সঙ্গে—! মনে পড়ে?

বিজয় উঠে দাঁড়ালো। লতিকা রায়ের মেক্‌আপের নিচে মুখখানা কতটা ফ্যাকাশে হলো দেখতে বসে থাকলো না সে!

গেল তার সাহিত্য-জীবনের অনুরাগিণী দীপান্বিতার কাছে। তার হাতে যে কলম কোদাল হয়ে উঠেছিলো, দীপান্বিতার হাতে তার নতুন মর্যাদা হয়েছে। পুজোর মুখে পত্র-পত্রিকার চাহিদা মেটাতে ব্যস্ত দীপান্বিতার কথা কওয়ার সময় হলো না।

ঘুরতে ঘুরতে নিউ আলিপুরে অভিনেত্রী সুপ্রিয়াদেবীর কংক্রীটের সুন্দর ছবির মতো বাড়ীটিতে কেন যে গেল বিজয়। আঠারো বছর বয়সের বাস্তুহারা মেয়ে কমলাবালা বিজয়ের কাছে এসেছিলো বাপের সঙ্গে। বলেছিলো—

এক্সট্রা মেয়ের অভিনয় করি। আমার একটা ছবি যদি আপনাদের কাগজে ছাপিয়ে দেন!

—আর সেই সঙ্গে বেশ জ্বালা দিয়ে এদের জীবনের কথাটা লিখে দেন!

মিনতি করেছিলো তার বাবা। বিজয় সেদিন ঘুরিয়েছিলো কমলাবালাকে। পুরো রাত ফ্লোরের মশার কামড় খেয়ে, এক পেয়ালা কড়া চা-এর কামড়ে খালি পেট জ্বালা করতো কমলার বিজয়ের অপেক্ষায় বসে বসে। ঘুমে ভেঙ্গে আসতো চোখ। বিজয় লেখাপড়া জানে, বিজয় শিক্ষিত, এই ভরসায় কমলা তার নিজের জীবনের দুঃখদুর্দশার প্রতি অধ্যায় খুলে ধরেছিলো বিজয়ের সামনে। ভেবেছিলো এ সব মানুষ সৎ। তাকে সাহায্য করবে। বিজয় সেদিন তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলো, কমলার পক্ষে তা ভোলা সম্ভব নয়।

আজ কমলার নাম সুপ্রিয়া। পঁচিশ বছর বয়েস। মাসে পঁচিশ হাজার রোজগার। টনসিল দেখাতে জুরিখ যায়। গরম পড়লে আল্পস্-এ যাবে এবার। সুপ্রিয়াকে কে বিয়ে করবে সেই হিসেব করতে অনেকেই ব্যস্ত।

বিজয়ের নামের স্লিপ্ পেয়েও সে নামলো তিনঘণ্টা বাদে। সাদা কাশ্মীরিতে লাল নীল হস্তীযূথ ছাপা। একপাল হাতীর ভার ফ্যানের বাতাসে উড়িয়ে নেমে এলো সুপ্রিয়া। সঙ্গে সঙ্গে নামলো মস্তো একটি দল। বোঝা গেল ওপরে আর একটি ড্রয়িংরুম রয়েছে। অধৈর্য বিজয় বললো—

—এতক্ষণ বাদে সময় হলো? কি করছিলে?

—এইযদিকথা হয়তবে আসুন আপনি। আমার শূটিং আছে।

—অথচ এই আমার-ই পা ধরে একদিন কেঁদেছিলে মনে নেই? বলেছিলে আপনার কাগজ দিয়ে একটু সুবিধে করে দিন।

—বলেছিলুম বুঝি?

বলে তাকালো সুপ্রিয়া। জ্বলে উঠলো তার নীল চোখ। বললো—

—বিজয়বাবু, পা অমন আমি অনেকেরই রোজ ধরি। আবার হাত ধুয়ে ফেলি ডেটল দিয়ে। মনে থাকা কি সম্ভব?

এবার চোখ স্তিমিত হলো আলস্যে। দুই হাত উৎক্ষিপ্ত করে বললো—

—সেদিনকার কমলাবালা সরকারকে আমার ত' আর মনে পড়ে না। আপনি বেশ মনে রেখেছেন। আপনার স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করতে হয় বিজয়বাবু।

বলে এ্যালসেশিয়ানটার মাথা পা দিয়ে নেড়ে, উঠে পড়লো সুপ্রিয়া।

অপমানিত মর্মাহত বিজয় বাড়ী ফিরল। যা কোন-কালেও ভাবেনি, কাগজ দেখে ভারতের বাইরের একটা চাকরীর জন্যে দরখাস্ত করলো। ভারতের বাইরে সুদানে তেলের খনিতে কাজ। পায় যদি ত' ভালো। চলে যাবে সেখানে। এই জীবনটাকে ফেলে যাবে। নতুন করে সুরু করবে।

ইন্টারভিউ-এ চাকরী হলো। বাড়ীতে সবাই খুসী হলেন। মা হেসে কেঁদে আকুল হলেন। কালীঘাটে পূজো দিয়ে এলেন। সুজয়, কুমুদ দাদার যাবার আয়োজনে তৎপর হলো। ওপরওয়ালা বাঙ্গালী। খুব ভদ্রলোক। বিজয়কে চা খেতে ডাকলেন ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেনের বাড়ীতে।

সুন্দর বাড়ী। কাঁচের মস্তো চৌবাচ্চায় হাঁস ছাড়া রয়েছে। বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে খরগোশ। ঘন সবুজ কার্পেট মোড়া

বারান্দায় বসে অফিসারটি টিন খুলে ধরলেন। বললেন—সিগারেট হোক! পারবেন কি সে দেশে টিকতে? মোটে তিন বছর। তারপরই ইণ্ডিয়াতে আনবে দেখবেন। দাঁড়ান স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। সে বেশ শিক্ষিত, বুঝলেন না!

একটি সুশ্রী লক্ষ্মীর মতো মহিলা দুটি ছেলের হাত ধরে এলেন। বললেন—

—ডাকছো? আমি যে ওদের স্কুলের ফাংশানে যাচ্ছি।

তারপর বিজয়ের দিকে ফিরলেন। তাঁর মুখে বিস্ময়। চোখে করুণা। মেয়েটি মাধবী। বিজয়ের ঘর থেকে যে একদিন কেঁদে পালিয়েছিলো প্রত্যাখ্যাত হয়ে। বিজয়ের মুখে কথা ফুটলো না। মাধবী বললো—

—তুমি!

বিজয় কোন কথা না বলে বেরিয়ে এলো। ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ী এলো। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যেই মনে হলো মাধবী তার ওপরওয়ালার স্ত্রী, সেই মাথা ঘুরে গেল তার। পুরোন বাড়ী। খাড়া সিঁড়ি। একেবারে নিচে গড়িয়ে পড়লো বিজয়।

ডাক্তার এলেন। জ্ঞান ফিরলো মাঝরাতে। চোখ খুললো বিজয়। চারিপাশে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ চোখে তাকিয়ে বললো—

—কুমুদ, দেওয়ালে ওটা কার ছায়া রে?

—তোমার, দাদা।

—আমার ছায়া!

করুণ বিস্ময়ে ছায়াটার দিকে তাকিয়ে বিজয় বললো—আমার চেয়ে আমার ছায়াটা লম্বা কেন রে? ওকে একটু ছোট হতে বল্‌না! শুনবে না?

মা চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। আর ছায়াটার দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত আর্তনাদ করে উঠলো বিজয়। সে পাগল হয়ে গেল।

এ্যাসাইলামে নিয়ে আসবার পথে পাশের চলমান ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে বিজয় কুমুদের হাত ধরে বলেছিলো—

—কুমুদ, আবার যদি ফিরে আসি, তবে পা দুখানা আমার কেটে দিস্!

ভয়ে ও দুঃখে কুমুদ মিনতি করে—দাদা!

—কেটে সমান করে দিস্। এই ধর্, তাহ'লে আমি আর ছ' ফুট তিন ইঞ্চি থাকবো না, সকলের মতো পাঁচফুটের ওপর আট বা ছয় ইঞ্চি হয়ে যাবো! বুঝলি কুমুদ?

—একটু ঘুমোও দাদা!

কিন্তু আবার উঠলো বিজয়। বললো—পাশের গাড়ীটা কি রে?

—বম্বে মেল।

—অত জোরে যাচ্ছে কেন?

—দাদা!

—আমার থেকে জোরে যাবে। কখ্খনো নয়। আমাকে ফেলে যাবে? জিতে যাবে? না!

বলে একটা চীৎকারে বিদীর্ণ হয়ে জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়লো বিজয়।